অচেনা মানুষ
সন্তোষ ঢালী

অচেনা মানুষ

সন্তোষ ঢালী

মিজান পাবলিশার্স

সন্তোষ ঢালী
মা: শ্রীমতীদেবী ঢালী
বাবা: নিত্যানন্দ ঢালী
জন্ম: পয়লা বসন্ত ১৩৭০, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪।
জন্মস্থান: পুকুরিয়া, কদমবাড়ি, রাজৈর, মাদারীপুর।
শিক্ষা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে
বি.এ. (অনার্স), এম.এ, বি.এড, এম.ফিল, পিএইচ.ডি।
সংগীত: বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে
উচ্চাঙ্গ সংগীতে সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ।
শখ: গিটার বাজানো, গান করা, আবৃত্তি করা।
তালিকাভুক্ত শিল্পী: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা ও
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
তালিকাভুক্ত গীতিকার: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
পেশা: অধ্যাপনা। অধ্যাপক, বাংলা। বি.সি.এস.(শিক্ষা)।
কর্মস্থল: অধ্যক্ষ
সরকারি নজরুল কলেজ, সাতপাড়, গোপালগঞ্জ।
পুরস্কার: একুশের সাহিত্য পুরস্কার, মুক্তধারা ১৯৯০,
সুনীল সাহিত্য পুরস্কার, মাদারীপুর ২০০৯,
অনুভব সম্মাননা, ঢাকা ২০১৩,
বিন্দু বিসর্গ সম্মাননা, গাইবান্ধা ২০১৬।
সম্পাদনা: নৈবেদ্য, ফুলকি, কালরাত।
প্রকাশিত বই:
কবিতা: ফসিল, প্রপার জন্য পঙ্‌ক্তিমালা,
একলব্যের তীর, ভুবনডাঙা, আকাল।
গল্প: অন্তরঙ্গ দ্বৈরথে, নিলামবালা, ছাই, দর্পণ, ৭১।
উপন্যাস: মন না মতি, অচেনা মানুষ।
পাঠ্য: ব্যাবহারিক বাংলা (ব্যাকরণ)।
অভিপ্রায়: ফিরে চল মাটির টানে।

অচেনা মানুষ সম্পর্কে

'অচেনা মানুষ' সন্তোষ ঢালীর দ্বিতীয় উপন্যাস। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই এ উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। সারা জীবন মানুষ এক সাথে থেকেও চিনতে পারে না একে অপরকে; এমনকি চিনতে পারে না নিজকেও। মানুষের মনই সবচেয়ে দুর্গম। সেখানে সহজে প্রবেশ সম্ভব নয়। তাই চিরজীবন মানুষ মানুষের অচেনাই থেকে যায়। এই সব দ্বন্দ্ব-সংশয় এ কাহিনির উপজীব্য। দর্শনের অধ্যাপক তুহিন কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁর কাছে মনে হয় জগৎটাই একটা চিড়িয়াখানা। মানুষ তারই এক জীব। নানা কারণে তাঁর ভিতর মনস্তআত্ত্বিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। বন্ধুর লাশ বহন করে পৌঁছে দিতে গিয়ে পরিচয় ঘটে বন্ধুর বোন হিমানীর সাথে। ধীরে ধীরে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। ঠিক বোন, নাকি প্রণয়িনী– বুঝতে পারে না তুহিন। নিঃসঙ্গ কটা দিন কাটাতে গিয়ে পুরীর সমুদ্র সৈকতে পরিচয় হয় ইংরেজি সাহিত্যের এক অধ্যাপক এবং তাঁর মেয়ে রাকার সাথে। জানা হয় অচিন্তনীয় আরও সঙ্কটপূর্ণ কিছু ঘটনা। রাকা জানতে পারে তার বাবা ওই অধ্যাপক নন; এক সাঁওতাল যুবক। এক পর্যায়ে রাকা নিখোঁজ হয়। খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। কিন্তু ছুটি শেষ হয়ে এলে তুহিনকে আবার ঢাকা ফিরে আসতে হয়। সে জানে হিমানীর বিয়ে হয়েছে। তাঁর খুব দেখতে ইচ্ছে হয় হিমানীকে, হিমানীর সংসারকে। গোটা কাহিনির মধ্যে ঘটনার ঘনঘটার চেয়ে মানসিক অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, সঙ্কট, যন্ত্রণা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সব নিঃসঙ্গতা, কষ্টবিলাসের কাহিনি-বিন্যাসই এ উপন্যাস। পাঠককে ভাবায়। কখনও ফেলে দেয় কঠিন ধাঁধায়। উপন্যাসটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

– প্রকাশক

প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল: ০১৫৫২৩৯১৩৪১, ০১৭১১ ৪০০২১৮
ফ্যাক্স ০৮৮ ০২ ৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা ২০০৮

স্বত্ব
সুমনা বিশ্বাস

প্রচ্ছদ
রফিকুল ইসলাম দুলাল

বর্ণবিন্যাস
অপরাজিতা

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১১২৩৯৫

মূল্য
১২০ টাকা মাত্র

ISBN
984-70050-0088-5

Achena Manush : Written by Santosh Dhali
Published by: Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka-1100
Printed by : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt) Limited
24 Srish Das Lane, Dhaka-1100

গৌর চন্দ্র মণ্ডল
পদ্মিনী ঢালী

প্রিয় দু'জন

এক

প্রতিদিন সূর্য ওঠে। ওঠে? প্রতিদিন সূর্য ডোবে। ডোবে? সূর্য কি ওঠে? সূর্য কি ডোবে? সূর্য ওঠেও না, সূর্য ডোবেও না। ও তো উঠেই আছে। সেই কবে থেকে জ্বলছে, তার ঠিক নেই। রয়েছে মহাকাশেই। মহাকাশ যদি মহাকালের কপাল হয়, সূর্য তার টিপ। ও ওঠেও না, ডোবেও না। শুধু দেখার তারতম্য। সকালও হয় না। সন্ধ্যাও হয় না। দিনও না। রাতও না। শুধু চেতনার ভুল। শুধু ছায়া। শুধু মায়া। শুধু আলোর ভেলকি। লুকোচুরি খেলা।

তুরাগের তীরে বসে, চিড়িয়াখানার পেছনে, যেখানে অথৈই জলের ওপাশে সন্ধ্যা জমেছে; সেখানে বসে ভাবছে। ভাবছে দর্শনের অধ্যাপক তুহিনশুভ্র। আকাশটা লাল। নিভে যাবার আগে কেমন লাল হয়ে ওঠে আকাশ। লাল কি তাহলে কালোর পূর্বাভাস? সূর্য ডুবে গেছে। না, ডোবে নি। চোখের আড়ালে চলে গেছে। কেন যেন মনে হয় সূর্যটা গলে মিশে গেছে আকাশের গায়। কিন্তু মনে হওয়াই তো বাস্তবতা নয়? ও চলে গেছে। চলে গেছে আসবে বলে। সবাই-ই কি ফিরে আসে, সবই কি ফিরে আসে যারা চলে যায়, যা চলে যায়? এই যে নদী, নিরন্তর চলে বয়ে, এ কি ফেরে? নদীতে স্রোত। স্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে তুহিন।
হঠাৎ তার নিজের নামের অর্থের কথা স্মরণ হলো। হিম মেরুশিখরে জমে আছে যে বরফ, তাই তো তুহিন? সে-ও কি জমে আছে বরফের মতো? সে-ও কি বরফের মতো নিঃসঙ্গ? এভাবে ভাবে নি তো কোনোদিন? তাহলে? শরীরের ভেতর একটা রক্তস্রোতের টের পায় তুহিন। উষ্ণ। তাহলে সে বরফ নয়। নদী। নদীর যেমন স্রোত আছে। রক্তেরও স্রোত আছে। জীবনেরও স্রোত আছে। নদী কি ফিরে আসে? আসে। স্রোত গড়ায় সমুদ্রে। সেখানের জল বাষ্প হয়ে, মেঘ হয়ে উড়ে যায় পাহাড়ে। জমে থাকে। গলে। আবার নদী হয়ে ফেরে। রক্তস্রোতও ফেরে। হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনী, শিরা উপশিরা হয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে। তবে নদী কি আর সে নদী থাকে? সেই জল, সেই সময়, সব কি একই থাকে? রক্তেও কি থাকে সেই একই উপাদান? থাকে না। তাহলে ফিরে এলেও এ দু'ফেরার মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। ভেতরে ভেতরে রক্তস্রোত টের পেলেও, ওই ভেতরে ভেতরে এও টের পাচ্ছে ওখানে মাঝে মাঝে বরফ জমা হয়। জল যেমন বাষ্প হয়ে, মেঘ হয়ে পাহাড়চূড়ায় জমে, চেতনার স্রোতও তেমনি বরফ হয়ে জমে থাকে মাঝে মাঝে বুকের ভেতর। একখণ্ড বরফের মতো শীতল, নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে।
চিড়িয়াখানার পেছনে, পেছন ফিরে বসে আছে তুহিন। পেছনের দিকে তার চিড়িয়াখানা, সামনে অনন্ত গোধূলি। গোধূলি না বলে সন্ধ্যা বলাই ভালো। কারণ, সূর্য ডুবেছে, যদিও সূর্য ডোবে না। রাত্রি তার কালো জিহ্বা দিয়ে চেটে নিয়েছে সমস্ত আলো। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে অন্ধকারের গুঁড়ো। পেছনে চিড়িয়াখানা। বাঘ, ভাল্লুক, পশু, পাখি, জন্তু, জানোয়ার, বনমানুষ। বহু ধরনের জীবনের সমাহার। জীবের সমাহার। রাতের অন্ধকারেই তাদের চোখ ওঠে জ্বলে। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে গর্জন। তুহিনের মনে হলো পৃথিবীটাই একটা চিড়িয়াখানা। এটা তার ক্ষুদ্র সংস্করণ। একটা নমুনামাত্র। এটা হলো মানুষের তৈরি খেলনা চিড়িয়াখানা। শিশু শিশু মানুষদের জন্য। মূলত পৃথিবীটাই প্রকৃত চিড়িয়াখানা। Real Zoo। আমিও চিড়িয়াখানার এক জীব। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দেখি, উপহাস করি। The world is a natural zoo।
দর্শনের অধ্যাপক তুহিনশুভ্র। সাহিত্যেও বেশ অনুরাগ তার। তার মতে সাহিত্যহীন জীবন, নুনহীন তরকারির মতো। সুরহীন গানের মতো। তার মতে সাহিত্য হচ্ছে সহযোগ। একের সাথে অন্যের। আগুনের যেমন আলো আর উত্তাপকে পৃথক করা যায় না, জীবন থেকেও তেমনি দর্শন আর সাহিত্যকে পৃথক করা যায় না। তাই দর্শন আর সাহিত্য দ্রবীভূত হয়ে মিশে আছে তার সমগ্র সত্তায়। সে লেখে। কবিতা। অন্য কিছু নয়। কবিতা হলো মাখন। অনেক দুধে যেমন একটু মাখন। অনেক ব্যাপক ভাবেরও তেমনি সারাংশ হলো কবিতা। এজন্যই কবিতা তার ভালো লাগে। খুব বেশি লেখে না। আসেও না। মাঝে মাঝে দু'একটা ভাব এসে যায়। তা-ও তালগোল পাকিয়ে যায়। তার কবিতার পাঠক সে নিজে। কারণ, তার মনে হয় ওগুলো আসলে কবিতা হয় না। তার নিজেরই ভালো লাগে না। কিন্তু এর চেয়ে ভালো সে লিখতেও পারে না। আসলে সে নিজেই ভালো বোঝে না কবিতা। মেয়ে মানুষের মনের মতো। বুঝি বুঝি, অথচ বুঝি না। কিন্তু, একটু ভালো লাগা যেন কোথায় লুকিয়ে থাকে তার মধ্যে। তাই যখন যে ভাব জাগে, সে ভাবকেই ধরে রাখে খাতায়।
আর একটা নেশা তার। ডায়েরি লেখা। রোজনামচা নয়। কোনো কিছু দেখে কোনো ভাবের উদয় হলে তখনই তাই লেখে। নিত্যদিনের নিত্যক্রিয়া লেখে না। নিজের জীবনের খুঁটিনাটি লেখা তার কাছে ছেলেমানুষি লাগে। তাই অনুভূতিটুকুই শুধু লিখে রাখে। মাঝে সাঝে নিজেই পড়ে। আর কেউ না। মনে হয় ওই লেখা-ই যেন তার সাথি। ও-ই তাকে সঙ্গ দেয় একমাত্র।
প্রথম যখন তার ভেতর কবিতার ভাব জাগে, তখন সে ক্লাস সেভেন এ। একটু ইতিহাস আছে এর। বাতাসে তখন ঢোলকের আওয়াজ। আশ্বিনের শেষ। বিলের জলে ভাটা। উত্তর দিক থেকে দেয় হিমেল হাওয়া। সন্ধ্যায় কেমন ধোঁয়ার মতো কুয়াশা। সারা মাঠে সবুজ ধানের পাথার। কেবল ফুল ধরতে শুরু করেছে ধানের ডগায়। এ সময়। দুর্গা পূজা। পাশের বাড়িতে। অনেক আত্মীয় সমাগম। তুহিন তখন হাফপ্যান্ট। সদ্য কিশোর। অধিবাসের সন্ধ্যায়

পুজোর বাড়িতে যখন ঢাক বেজে উঠল, আর ঘরে থাকল না তুহিন। অনেক রাত পর্যন্ত পুজো বাড়ি থেকে, চলে এল। পরদিন সন্ধেয় আবার। অনেক ছেলেমেয়ে আরতি নাচল। ছোট্ট একটি ফুরফুরে মেয়ে, সম্ভবত ফাইভ/সিক্সে পড়ে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুন্দর একটা কবিতা আবৃত্তি করল। কবিতাটা তার ভালো লেগেছিল। কবিতা না মেয়েটি? আজ আর তা মনে নেই তার। হয় কবিতার জন্য মেয়েটিকে, নয় মেয়েটির জন্য কবিতাকে সে ভালোবেসেছিল। নামটাও তার মনে নেই আজ আর। চেহারাও না। তবে ডোরাকাটা একটা ফ্রক ছিল গায়ে। কে যেন রসিকতা করে বলেছিল– বাঘের মাসি। এটা তার মনে আছে বেশ।

সেই থেকে মেয়েটিকে তার একটু ছুঁতে ইচ্ছে করছিল। ছুঁতে, না কথা বলতে? কিছুই মনে নেই আজ আর। তবে তারপর যে ক'দিন পুজো দেখতে গেছে, প্রতিমা দেখা আর হয়ে ওঠে নি। শুধু আড়চোখে মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে থাকত। প্রতিমা দেখার ছলে সে মেয়েটিকেই দেখত। মেয়েটি চোখের আড়াল হলে তার বুকের ভেতর ব্যথা হতো। কেমন এক ধরনের কষ্ট। কষ্ট কিনা তা সে বোঝে না। সে কষ্টে কেমন একটু আরাম ছিল। কেন কষ্ট, কেন আরাম– তা সে বোঝে নি। আজও বোঝে না। মেয়েটির সাথে তার কথা হয় নি।

পুজো শেষ। শেষ হলো বিজয়া দশমী। এবার বিসর্জনের পালা। পুজো বাড়ির সবাই কাঁদছে। এতদিনের আনন্দ যেন ফাটা বেলুনের মতো এক ফুৎকারে নিভে গেল। থেমে গেল শঙ্খধ্বনি, থেমে গেল ঢোলকের ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্যি। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখের পাতা। বুকে বিদায়ের ভাব। তা বিসর্জনে তুহিনের কিছু যায় আসে না। সে চোখ ভ'রে মেয়েটিকে দেখল। মেয়েটি কাঁদে নি। সারা গ্রাম কেমন হঠাৎ যেন থমথমে হয়ে গেল। বরফের মতো নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন প্রকৃতি। মনটা যেন কেমন হয়ে গেল তুহিনের।

পরদিন সকালবেলা পুজোবাড়ি গেল আবার। দেখে ঘাটে বাঁধা নৌকা। ছই দেয়া। অনেকগুলো মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো দাঁড়িয়ে কাদের বিদায় দিচ্ছে। এপাশে মাঝি খুলে দিল নৌকার বাঁধন। ওপাশে গলুইরে কাছে ছইয়ের ভেতর থেকে বেরুল সেই মেয়েটি। কেমন যেন কষ্ট হলো তুহিনের– চলে যাচ্ছে? কে ও? কী তার নাম? তাও জানে না সে। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা লাগছিল। কী ভাববে? তাই আর জানা হয় নি কিছুই। মনটা হু হু করে উঠল। নৌকাটা কিছুদূর গেলে মেয়েটি ছইয়ের মধ্যে গেল। তবুও সে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কারণ, এই নৌকা দেখলেই মনে হয় তাকে দেখা হয়। কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হলো– ঘাটে সে একা। অন্য যারা ছিল, চলে গেছে এতক্ষণে। লজ্জা পেল সে। যেন নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছে নিজে।

ফিরে এল বাড়ি। মন বসাতে পারল না পড়ায়। খেতেও ভালো লাগল না। ঘুম হলো না। অনেক রাতে সম্ভবত ঘুম এল। মধুর একটা স্বপ্ন দেখল– আমার হাতটা একটু ধরবে তুমি, নৌকায় উঠব? তুহিন হাত ধরে তাকে নৌকায় তুলে দিয়েছে। মেয়েটি হেসে বলেছিল– তুমি খুব ভালো, আমাকে তুলে দিয়েছ। তুহিনের কান গরম হয়ে উঠছিল। কেমন একটু লজ্জা পেয়ে গেছিল। খুব ভালো লেগেছিল। তুহিন জড়তা সহকারে বলেছিল– তোমার কবিতা খুব ভালো লেগেছিল আমার। আজও তুহিন বুঝতে পারে না– কবিতা না মেয়েটিকে ভালো লেগেছিল তার? কবিতার জন্য মেয়েটিকে, না মেয়েটির জন্য কবিতাটা? মেয়েটি মৃদু হেসে বলেছিল– তুমি বুঝি কবিতা খুব ভালোবাস? পড়তে পার তুমি? এরপর আবার যখন আসব, তখন শুনব তোমার কবিতা। আমিও শুনাব কবিতা আরও। 'সেই বোষ্টুমি আর এল না।' কথা রাখে নি স্বপ্নের স্বজন। 'কেউ কথা রাখে না।'

মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল তুহিনের। সকালের রোদ উঠে গেছে অনেক আগেই। স্কুলের বেলা হয়ে গেছে। কী এক পরিতৃপ্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল তার! কিন্তু মেয়েটি চলে গেছে মনে হতেই হু হু করে উঠল মনটা। কেমন এক কষ্ট হলো বুকের ভেতর। স্কুলে যেতে ইচ্ছে হলো না। তবু গেল। পড়ায় মন ছিল না। সব সময় মেয়েটির সেই স্বপ্নের কথাগুলো মনের মধ্যে ভাসতে লাগল।

বাড়ি এসেই তার বাংলা বই খুলে বসল। একটা কবিতা মুখস্থ করতে হবে। ভালো দেখে। ভালো করে। এর পরেরবার যখন সে আসবে– তখন শুনাবে। হঠাৎ তার মনে পড়ল– সে তো কবিতা শুনতে চেয়েছে স্বপ্নে। তাহলে, কীভাবে শোনাবে তাকে? আসবে কিনা আর তা-ই বা কে জানে। তবু মন বলল– সে আসবে। আবার আসবে। তাই একটা কবিতা মুখস্থ করে রাখতে হবে। এলে সেধে সেধে গিয়ে শুনিয়ে আসবে। কিন্তু তার বইয়ের কোনো কবিতাই তার পছন্দ হলো না। সেই মেয়েটির কবিতাটা কত ভালো ছিল। একটা লাইনও তার মনে নেই। তবুও কী চমৎকার কবিতা? নাকি সে মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছিল বলেই কবিতাটা ভালো লেগেছিল? সে মনমতো কবিতা খুঁজে পেল না। তাই মেয়েটিকে নিয়েই সে লিখে ফেলল একটা কবিতা। কাউকে দেখায় নি। লজ্জায়। সেই কবিতা লেখার হাতেখড়ি। সেই থেকে কবিতা লেখার শুরু।

রাত হলেই একা একা পড়ত আর ভাবত মেয়েটির কথা। অবশ্য আজ আর মনে নেই একটি শব্দও সেই কবিতার। মনে নেই মেয়েটির কথাও। আর কখনও আসেও নি মেয়েটি। দেখাও হয় নি কোথাও আর কোনোদিন। কিংবা হয়েছে। চেনে নি। চিনতে পারে নি। তবে স্মৃতিটুকু আজও মন থেকে যায় নি মুছে। তবে কি মেয়েটিকে সে ভালোবেসে ফেলেছিল? এ কেমন ভালোবাসা। তখন কী-ই-বা বুঝত ভালোবাসার? তবুও মনে হলো– মেয়েটিকে আসলেই সে ভালোবেসেছিল। সেই ছিল তার প্রথম ভালোবাসা। প্রথম প্রেম। তাহলে ভালোবাসা কি এভাবেই আসে? প্রেম কি এভাবেই উঁকি দিয়ে যায় হৃদয়ে, যে তার সুবাস চিরজীবন লেগে থাকে মনে? এখনও তুহিন

ভালোবাসে তাকে। তার সেই কষ্টের স্মৃতি আজও সুখময়। আজও মনে হয়– সে আবার আসবে তার কবিতা শুনতে। তাই সে কবিতা লিখে চলে। সে তো জানেই– যে যায়, সে আবার ফিরে আসেই। কোনো না কোনোভাবে আসে। হয়ত ভিন্নরূপে অন্যরূপে।

রাত নেমেছে তার চারদিক ঘিরে। রাতের পেয়ালা উপচে মাটির বুকে জমছে গাঢ় কালো অন্ধকার। রাত যেন কালো এক মায়াবী চাদর। কত বাজে? সময় কত? ঘড়ি নেই হাতে। ঘড়ি থাকলেও দেখা যেত না। অন্ধকার। তাছাড়া সময় কী? সময়কে কি এভাবে সময় মেপে বাঁধা যায়? সময় দিয়ে এভাবে বাঁধা যায় না জীবনকে। সময় বয়ে যাক তার মতো। জীবন চলুক তার পথে। উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। অন্ধকার যেন আঠার মতো লেগে আছে তার গায়। পেছনে বাঘের গর্জন। সিংহের হুঙ্কার। নেকড়ের চিৎকার। হায়নার আর্তনাদ।

চিড়িয়াখানা সরগরম। তুহিনের মনে হচ্ছে তার ভেতরটাই চিড়িয়াখানা। এই সমস্ত গর্জন, চিৎকার সবই তার ভেতরে। টের পায় সে। সামনে অন্ধকারে তুরাগের স্রোত। টের পায় তার ভেতরেও সে স্রোত। রক্তের স্রোত। তাহলে কি তার ভেতরেও একটা নদী আছে, যে এভাবে অন্ধকারেই যায় বয়ে? অন্ধকারের নদী?

আকাশ ভরা তারার হাহাকার। আশ্চর্য! চোখ বুঁজলেও সে দেখতে পাচ্ছে গোটা আকাশ। দেখতে পাচ্ছে কোটি কোটি তারা। অনেকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে দেখতে পেল পুরো আকাশ জোড়া একটি তারা। বিশাল এক তারা। অর্থাৎ এমন কোনো এক বিন্দু ফাঁকা জায়গা নেই যেখানে তারা নেই। এক সময় চোখ আর ঘাড় ব্যথা হয়ে এল। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। একেই কি বলে মোহ? একেই কি বলে মায়া?

বড় আশা করে একটা খাতা আর একটা কলম এনেছিল সাথে। খাতা মানে ডায়েরি। লেখার ডায়েরি। ওটাই তার কবিতা লেখার খাতা। সবসময়ই থাকে সাথে। যদি কখনও প্রয়োজন হয়? আজ সুন্দর করে একটা কবিতা লেখার কথা ভাবছিল প্রকৃতি নিয়ে। হলো না। ভাবটা যেন কেমন গুলিয়ে গেল।

নিজে সে লেখে। কিন্তু ওগুলো কবিতা হয় কিনা তা নিয়ে তার সংশয় আছে। তার ভালো লাগে না মোটেই। তবে অন্যের ভালো লাগবে কিনা কে জানে? লিখতে ভালো লাগে বলেই লিখে যায়। ধরে রাখে সময়ের সেই অনুভূতিকে। সময়ের বুদ্বুদকে মমি বানিয়ে রাখে ঐকান্তিক মমতায়। এটা যদি কবিতা হয় তো হলো, না হয় কিছু এসে যায় না। সে লিখে যায়।

অনেকক্ষণ সে বসে আছে। অনেকক্ষণ? অনেকক্ষণ কতক্ষণে হয়? তার তো মনে হচ্ছে এই কেবল বসল? সময় কোন ফাঁক দিয়ে গড়ায়ে যায়? চুঁইয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা স্যালাইনের মতো? কিংবা মৃত্যুপথযাত্রীকে দেয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্তের মতো। গোটা রাতও যদি যায় কেটে তবুও তো অনেকক্ষণ বলা যায় না? মহাকালের ইতিহাসে একটা জীবনই মুহূর্তমাত্র? এ তো একটামাত্র রাত? তাই সে বসে থাকে ঠায়। তাগিদ অনুভব করে না কোনো। এ-ও তার কাছে মায়া মনে হয়। হঠাৎ মনে পড়ে যায় আগামী দিন বি.এ. ক্লাসে 'মায়াবাদ' পড়াতে হবে। A lecture about Illusion।

কী এক ঘোরে কেটে গেল সময়। টের পেল এক সময় পাখি ডাকছে। কিচিরমিচির করছে ভোরের পাখি। ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার জাগছে। পুব আকাশ লাল কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ পেছনে চিড়িয়াখানা। তবে ফর্সা হয়ে গেছে। ভোর হতে বাকি নেই, বোঝা গেল। আকাশের সব তারা মিলিয়ে গেছে আকাশের গায়। আকাশটা যেন কোনো শিশুর একটা অলিখিত নীল স্লেট। তাহলে সূর্য উঠেছে? উঠেছে মানে? সূর্য কি ওঠে? ও তো উঠেই আছে? শুকতারাটাও আছে কিনা জ্বলে, দেখা যাচ্ছে না। ও তো উঠেই থাকে? এই যেমন ঘুম। মানুষ ঘুমায়। আসলে কি ঘুমায়? ঘুম কাকে বলে? হৃৎপিণ্ড তো চলতেই থাকে। তার কোনো বিশ্রাম নেই। জন্ম থেকেই চলছে। চলছে। মৃত্যুতেই তার প্রকৃত বিশ্রাম। ঘুম তো মৃত্যুরই নামান্তর। ছোট ছোট মৃত্যু। মৃত্যু হলো বৃহৎ ঘুম। যে ঘুম আর ভাঙবে না কোনোদিন। অনন্ত ঘুম। অনন্ত বিশ্রাম।

পৃথিবী জাগছে। জাগছে? তাহলে ডুবে ছিল এতক্ষণ? পশুরা ঘুমুচ্ছে। রাতে জাগে বলেই ঘুমায়। পাখিরা শুরু করেছে ডাকতে। পাখিরা রাতে ঘুমায়। ঘুমায়? গাছ? গাছেরা? গাছেরা ঘুমায়? আশ্চর্য কষ্ট ওদের। মনের কথা বলতেও পারে না মুখে। নড়তেও পারে না। কোথাও যাবে কারও কাছে, তা-ও পারে না। নিশ্চল বোবা। নির্বাক সহা। ওর কাছেই আসে সবাই। পশু, পাখি। রাতে। মানুষ। প্রেমিক-প্রেমিকা। দিনে। কখনও কুঠার হাতে কাঠুরিয়া। তুহিন ভাবে– গাছ হতে পারলেই ভালো হতো। সে একটা গাছকে চেনে। চেনে? কাউকে, কিছুকে কারও পক্ষে চেনা সম্ভব? না সম্ভব নয়। কারওকে কতটুকুইবা চেনা যায় তার বাইরেটা দেখে? অথবা চেনে না। জানে। জানে? কতটুকুই বা জানে? জানা যায়? বরং বলা যায় মাঝে মাঝে দেখে। একটা গাছ দেখে। প্রায় প্রতিরাতেই যে কাঁদে। তার বাসার পাশেই। রাত যত গভীর হয়, কান্না তত বৃদ্ধি পায় গাছের। বিজ্ঞানীরা বলবেন– প্রস্বেদন। বলুক। আসলে তো গাছও কাঁদে। তার দুঃখই বেশি। সে বলতে পারে না। নড়তে পারে না। শুধু ভেতরে ভেতরে কাঁদে। চিড়িয়াখানার গাছও কাঁদে। কাঁদে খাঁচায় খাঁচায় বন্দি পশু-পাখি। পৃথিবীটা যেমন একটা চিড়িয়াখানা, তেমনি প্রতিটা মানুষই এক একটা চিড়িয়াখানা। তার ভেতরও পশু-পাখি খাঁচায় বন্দি। হায়েনা-সিংহ গর্জন করে। পাখি গান গায়। নানা রঙের ফুল ফোটে। গাছ কাঁদে। প্রতিটি মানুষই এক একটা চিড়িয়াখানা পুষে রাখে ভেতরে। বিশ্ব-নিখিল চিড়িয়াখানাময়।

তুহিনও কি একটা চিড়িয়াখানা পুষে রাখে তার ভেতরে? ভেবে দেখে। মনে হয়। যদিও সূর্য ওঠেও না, ডোবেও না। তবুও সে ভেতরে পুষে রাখে এক সূর্যাস্ত এবং এক সূর্যোদয়। প্রতি মুহূর্তে পুষে রাখে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়। বিষাদ এবং বিশ্বাস। বিষণ্নতা এবং বিশ্বস্ততা। আনন্দ এবং বেদনা। সত্য এবং মিথ্যা। হাসি এবং কান্না। উল্লাস এবং অশ্রু। তুহিনের পেছনে চিড়িয়াখানা। ভেতরে চিড়িয়াখানা। সামনে নদী। নদী মানে সময়। সময় মানে গতি। গতি মানে শেষ হওয়া। শেষের পথে ধাওয়া। ছোটা। কিন্তু যার শেষ নেই, তার শেষ হবে কীভাবে? সময় এবং শূন্যতার শেষ নেই। শুরুও কি ছিল? জানে না সে। তবে শেষ যে নেই, তা কী করে জানে? কেউ জানে না। কেউ জানবে না কোনোদিন। জানে না এবং জানবে না। তবে চেষ্টা করবে। পারবে না জানতে। শুধু প্রচেষ্টা চলবে। ব্যর্থতা থাকবে। প্রচেষ্টা এবং ব্যর্থতা। এরই নাম বোধ হয় জীবন? এই-ই বোধ হয় জীবন?

এতক্ষণে রোদ এসে চেটে নিল অন্ধকার। আশ্চর্য! একবার আলোকে চেটে নেয় অন্ধকার। আবার অন্ধকারকে চেটে নেয় আলো। শুধু চাটাচাটি। এ কি শুধু আলো অন্ধকারের? সত্য-মিথ্যা। ভালো-মন্দ। সুখ-দুঃখ। ছোট-বড়। পাপ-পুণ্য। সব কিছুই একে অপরকে চাটে। কখনও একটার জয়। কখনও অন্যটার। এই জয়-পরাজয় নিয়েই জগৎ। রোদ তার শাসন এসে চাবুক পেটাচ্ছে তুহিনের গায়। চমকে ওঠে। জীবনটাই তো একটা চমক!? সময় কত কে জানে? যদিও সময়ের বুকে দাগ কাটা যায় না। তবুও। ক্লাস আছে। মাথার ভেতর হঠাৎ এক পাক দিয়ে ওঠে সারারাত। মুহূর্তে রাত এসে জটলা পাকায়– নদী, চিক্‌চিক্ স্রোত, শেয়ালের ডাক, শকুনের কান্না, মায়াবাদ, অন্ধকারের বুকে তারা, কে যেন আসি আসি করেও আসে না হৃদয়ে, বাজপাখির চিৎকার, যেদিন জানতে পারল মেয়েটি তাকে ভালোবাসে না, নদীর জলে শুশুক, ক্লাসে একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে পড়ানো ভুলে যায় একদিন, হঠাৎ ফ্যানটাকে মনে হয় পাকা কাঁঠালিচাঁপা ফুল, ঘুরছে মাথার ওপর আকাশ, না ব্রহ্মাণ্ড, ভেতরে চিড়িয়াখানা, আশ্চর্য কারও চিঠি না এলে এত খারাপ লাগে কেন? চেঁচিয়ে ওঠে একটি বানর। চিঠি এল। আনন্দ। ফুলের গন্ধ ছোটে বাতাসে। চিঠি খুলল। ডেকে উঠল ওয়াক পাখি। পড়ল। বুকের ভেতর এক টুকরো বরফ থাকল আটকে। চিড়িয়াখানার খাঁচায় জেগে উঠে ঘুমিয়ে পড়ল সিংহ। ঠাণ্ডা জলের মতো সিরসির করে মাথা দিয়ে নেমে গেল রাত। রাত যেন হুইস্কি। আচ্ছন্ন করে দেয় সব। একটি মেয়ের জন্য তার বুকের ভেতর কষ্ট। একটা মড়া বেড়াল লটকে থাকে শ্বাসনালীতে। ইচ্ছে করলে নখের আঁচড়ে সরিয়ে দিতে পারে হিমানী। ঠেলে ফেলে দিতে পারে ভাগাড়ে। হিমানী, নিজেই যেন মড়া বেড়াল। সে কি পারে না কোনো আঁচড় কাটতে? পারে না ডুবিয়ে দিতে নখল থাবা? পারে না রক্তক্ষরণ ঘটাতে? পারে। হচ্ছে তো। কই হচ্ছে? থেমে আছে। থেমে যাচ্ছে। থেমে যাচ্ছে সব। বরফ। জমাট বরফ। বিশ্ব বরফময়।

উঠে পড়ে। হাঁটে। মাথার ভেতর রাত। রাতের মসলা। চিড়িয়াখানা। মায়াবাদ। হাঁটে, দর্শনের অধ্যাপক তুহিন। হাঁটেন না বলে হাঁটে বলাই ভালো। প্রভাষক হিসেবে কেবল ঢুকেছে কলেজে। নতুন। প্রভাষক না বলে অধ্যাপক বলাই ভালো। অধ্যাপনা করেন বলেই অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই এখানে। ছাত্র থেকে শিক্ষক। সে মনে করে শিক্ষকই আদর্শ ছাত্র। শিক্ষক হলেই হওয়া যায় একমাত্র উপযুক্ত ছাত্র। তুহিন হাঁটে। বাসার দিকে। স্নান। খাওয়া। পোশাক পরিধান। আবার হাঁটা। কলেজ। ক্লাস। মায়াবাদ। হাঁটে তুহিন। আসলে গতিই তো জীবন। তাই চলা ছাড়া কিছু নেই এখানে। তুহিন চলে। বাসায় পৌঁছায়। গেটে বিরাট তালা। পকেটে হাত। হাত চাবি খোঁজে। পায় না। এই-ই হয়। দরকারের সময় দরকারি জিনিসই যায় না পাওয়া। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনের কোনো জটের তালা খোলার চাবিই নেই তার কাছে। চাবি নেই। সামনে বড় এক তালা। বন্ধ। রাস্তা বন্ধ। লালবাতি। Red Signal। থামো। থেমে পড়ো। থামা মানে নিশ্চলতা। নিশ্চলতা মৃত্যুর আভাস বহন করে। নিশ্চলতা মানে মৃত্যু। সামনে বড় তালা। বন্ধ। মানে মৃত্যু। চাবি হারিয়ে গেছে। না হারায় নি। ভুলে চাবিই নেয়া হয় নি। ভেতরে রেখে চাবি তালা বন্ধ করে আসছে। ভুলে ভরা জীবন। মনে পড়ল 'অতল জলের আহ্বান' ছবির সুজাতা চক্রবর্তীর সেই অনবদ্য গানটা– 'ভুল সবই ভুল, এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা, সে ভুল'।

জীবনের জটের মধ্যেই হারিয়ে হারিয়ে যায় জট খোলার চাবি। আশ্চর্য! তালা খোলার চাবিই সে আটকে রেখেছে তালা দিয়ে। তাহলে কি এই-ই হয়? হিমানীর মনের তালা খোলার চাবিও কি আটকে পড়ে গেছে হিমানীর মনের মধ্যে? কী করবে ভাবতে থাকে। ভাবে। আবার ভাবে। শেষে হাঁটে। হাঁটতে থাকে। কারণ হাঁটাই তো তাকে বাঁচিয়ে রাখে। গতিই যে জীবন। না জীবনই গতি? কোনটা ঠিক? সে হাঁটে। যাবে সরাসরি কলেজে। ক্লাসে। সেখানে কতগুলো মুখ হাঁ করে থাকে তাকে গেলার জন্য। তার কথা গেলার জন্য। মনে হয় বাগান। ফুলের বাগান। ফুলের ছাড়া বাগান হয়? হতে পারে। ক্লাসটা মনে হয় ফুলের বাগান। হাঁ হয়ে ফুটে থাকে কতগুলো ফুল। তুহিন মালি। জল ঢালে। জল মানে জ্ঞান। বিদ্যা। পাণ্ডিত্য। সে ভাবে– কী ঢালবে সে? কী জ্ঞান দেবে? সে তো নিজেই কিছু জানে না? যা জানে না, তা শিক্ষা দেয়া ঠিক নয়। না জানলে শিক্ষাই বা দেবে কীভাবে? কী জানে সে? সময়ের শুরু আর শেষ পারবে বলতে। শূন্যতার শেষ সীমানা কোথায়? পারবে বলতে? জন্মইবা কী, মৃত্যুই বা কী? পারবে বলতে? পাপ কী, পুণ্য কী? পারবে বলতে? সে কে? চিড়িয়াখানা কী? জগৎ কী? জীবন কী? তালা কী? চাবি? হিমানী কে? সে কি বরফ? না গলবে? তুহিনও কি গলবে? সে জানে না। কিছুই জানে না। তবুও পড়ায়। জানার ভান করে। পড়াতে হবে। তাই পড়ানো। শুনতে হবে। তাই শোনা।

ছাত্ররা ভাবে তুহিন যা পড়াচ্ছে, তা-ই সত্য। জানে না তারা– সত্য কিছু নয়। মিথ্যা কিছু নয়। সব সত্য-মিথ্যাময়। সব প্রহেলিকা। সব কুহেলিকা। সব মায়া। মোহময়। আসক্তি। আর এই দ্বন্দ্বেই জীবন দোলে। সত্য এখানে মরীচিকা। আলেয়ার আলো।

ক্লাসে ঢোকে তুহিন। ছাত্ররা দাঁড়ায়। বসে। তুহিনের মনে হয় একঝাঁক বুনোহাঁস জলের তল থেকে ভেসে উঠে আবার ডুবে গেল। না। ডোবে নি। ভেসে আছে। ওরা উড়াল দিয়ে আবার ভেসে উঠল। বসে থাকল। সার দিয়ে 'আসি' বলে ঢুকে পড়ল মেয়েরা। মেয়েরা কমন রুম থেকে আসে। কমন রুম না বলে বলা উচিত লেডিস রুম। মেয়েগুলো ঢুকছে যেন বাচ্চা হরিণ। ঢুকছে চিড়িয়াখানায়, খাঁচায়। ছেলেরা যেন শিয়াল হয়ে গেল হরিণের গন্ধে। খাঁচায়। ছোঁক ছোঁক করতে লাগল। মেয়েরা যাচ্ছে। 'আসি' বলে ঢুকে পড়ল। তুহিন ভাবছে– কেউ কি আসতে পারে? সবাই তো শুধু যায়-ই। তবে আসি বলল কেন? বাংলার অধ্যাপক ব্যাকরণ মনে হয় ঠিকমতো পড়ান না। আসি শব্দটা বাদ দিয়ে দেয়া উচিত অভিধান থেকে।

মেয়েরা এল। একটি মেয়ের কোমর বেয়ে কী একটা পড়ে গেল টুপ্ করে। সাদা রুমাল। পা দিয়ে চেপে ধরল সামনের বেঞ্চের একটা ছেলে। তুহিন দেখতে পাচ্ছে ছেলেটার পায়ের নিচে মেয়েটির রুমাল। না। রুমাল না। ছেলেটার পায়ের নিচে মেয়েটার হৃৎপিণ্ড। হৃদয়। হৃদয়টা সাদা। মেয়েটা টেরই পেল না। উপরের দিকে তাকাল। মাথার উপর ঘুরছে কাঁঠালিচাঁপা ফুল। না ফ্যান? ফ্যানে কি এত সুন্দর গন্ধ হয়? না। হয় না। এ ফুলও না। মেয়েদের গায়ের গন্ধ। হৃদয়ের গন্ধ। প্রেমের গন্ধ। হিমানীর গন্ধ। ছেলেটার পায়ের নিচে রুমাল নয়। মেয়েটার হৃদয়। হৃদয় নয়। ও হিমানীর প্রেমের লাশ। মেয়েদের গন্ধ নয়। কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ নয়। লাশের গন্ধ। রুমাল পড়ে গেছিল মেয়েটি দাঁড়াল। সুন্দরী। সুন্দরী? কাকে বলে সুন্দর? আসক্তি জন্মালেই সুন্দর হয়। ভালো যা লাগে তাই সুন্দর। সুন্দর বলেই ভালো লাগে না। নাকি উল্টো? একটা কিছু হবে। মোট কথা ভালো লাগা বা আসক্তি এবং সুন্দরের ভেতর একটি সেতু আছে। আগুনের আলো আর উত্তাপের মতো। একের উপর অন্যে নির্ভরশীল। সে হিসেবে মেয়েটি সুন্দর।

সুন্দর দাঁড়াল। যে মেয়েটির হৃদয় এইমাত্র মাটিতে পড়ে, লাশ হয়ে চলে গেল পায়ের নিচে, সেই মেয়েটি দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল– স্যার, আপনার কি কিছু হয়েছে আজ? কেমন লাগছে আপনাকে। কেমন যেন করছেন! চেতনার বুদ্বুদ জেগে উঠেই ফেটে যায়। বলে– তোমরা চিড়িয়াখানা চেনো? সবাই অবাক হয়ে যায়। এ আবার না চেনে কে? তাই নিশ্চুপ থাকে। মেয়েটি দাঁড়িয়েই থাকে। অধ্যাপক বলেন– চিড়িয়াখানা চেনো তোমরা? পাশ থেকে কে ফুঁস করে বলে উঠল– চিনি স্যার। আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক চিড়িয়াখানার জীব। অধ্যাপক– কে, কে বলল এ কথা? কেউ সাড়া দিল না। সৎ সাহসের অভাব। অধ্যাপক– ঠিক বলেছ। আমরা সবাই চিড়িয়াখানার জীব। তুমি, আমি, সে– মধ্যম, উত্তম, নামপুরুষ। প্রত্যেকের ভেতর এক একটা চিড়িয়াখানা আছে। সেখানে ক্যাঙারু লাফায়, হায়েনা ওঁৎ পাতে, শকুন কাঁদে, চিতা ছোটে, শুঁড় তোলে হাতি, সুর তোলে পাখি, নেকড়ে হানা দেয়। আবার প্রত্যেকেই এক একটা চিড়িয়াখানার জীব। বদ্ধ। খাঁচায় আবদ্ধ। ছটফট। বেরুতে পারে না। বুক ফাটে। মুখ ফোটে না। অন্তরে আবদ্ধ লাভা। গলিত লাভা। ফুঁসছে। পৃথিবীতে চিড় ধরে। ফেটে যায় পাথর। চৌচির। চৌচির।

রুমাল পড়ে যাওয়া মেয়েটি, দাঁড়ানোই– স্যার আপনার শরীর স্যার–। অধ্যাপক– হ্যাঁ এই শরীর, এটাই চিড়িয়াখানা। মন বদ্ধ পশু। ছাত্রী– না স্যার, শরীর খারাপ স্যার। অধ্যাপক– খারাপ। খারাপ কী? খারাপ কী? ভালো কী? সব আপেক্ষিক। সত্য-মিথ্যা, খারাপ-ভালো সব আপেক্ষিক। মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি আপেক্ষিক। শঙ্কায়িত মেয়েটিও হেসে ওঠে স্যারের কথা শুনে। স্যার পড়াচ্ছেন– মায়াবাদ। দেখছেন সামনে মায়া। মায়াময়ী নারী। মোহময়ী নারী। হাসছে। দাঁত ছাড়া কিছুই যাচ্ছে না দেখা। শুধু ঝকঝকে দু'পাটি দাঁত। সাদা। মুখ নেই। চোয়াল নেই। ললাট নেই। দু'পাটি দাঁত। না। দাঁত নয়। শ্বেত হংস-পাখা। এক জোড়া পাখা পৎপৎ। হাওয়ায়। সাদা ডানা উড্ডীন। হাসে। নাচে। নৃত্যরত পাখা। ভাসছে হাওয়ায়।

অধ্যাপক ভাবছেন– ও মায়া। দেখছেন– ও মায়া। বলছেন– ও মায়া। সবাই হো হো। লজ্জা পেয়ে মেয়েটি কামরাঙা। বসে পড়ল মাথা নিচ। অবনতা। অধ্যাপক দেখলেন– চুপসে গেল একটি ফুল। শুকিয়ে গেল একটি কুঁড়ি। বাগানে। ঢং ঢং। ঘণ্টা বাজল। অধ্যাপক শুনলেন– ফুল ঝরার শব্দ। আশ্চর্য! ফুল ঝরে গেলেও শব্দ হয়? হোক। হতে পারে। দাঁড়িয়ে থাকে। –স্যার ঘণ্টা পড়ে গেছে। ক্লাস শেষ। অধ্যাপক ভাবে– শেষ? শেষ কোথায়? কী শেষ হলো? কে শেষ হলো? সাদা রুমালটা শেষ? হৃদয় শেষ? সুন্দরী রুমাল পড়ে যাওয়া মেয়েটির হৃদয় শেষ? কত তাড়াতাড়িই সব শেষ হয়? শেষ হয়ে যায়? শুরু বুঝতে না বুঝতেই শেষ? নাকি ভালো করে আবার শুরু হবার জন্যই শেষ হয়? –স্যার, ঘণ্টা পড়ে গেছে। ঘণ্টা পড়ে গেছে? তাই? ঘণ্টা কি পড়ে? নাকি বাজে? ঘণ্টা তো ঝুলেই থাকে? তাহলে পড়ে গেছে বলে কেন? মাথায় ঢোকে না। ঘণ্টা সঙ্কেত দিয়েছে চলে যাবার। ও, হ্যাঁ বলে চক, ডাস্টার, খাতা বগলে বের হলেন। হাঁটলেন। কারণ হাঁটা মানেই চলা। আর চলা মানেই জীবন। জীবন মানেই– কী? কী তা সে জানে না। মনে হয় জীবন মানেই এগিয়ে যাওয়া। ক্রমাগত আরও যন্ত্রণার দিকে এগিয়ে যাওয়া। জীবন মানে নিঃসঙ্গতা। সবার মধ্যে থেকেও কোথায় যেন একা। সবাই। সব। প্রত্যেকেই একা। বড় একা।

কোথায় যেন এত আলোর মধ্যেও নিভৃতে জ্বলে এক নিঃসঙ্গ সলতে। জ্বলে আর পোড়ে। নিভৃতে। একাকী। কেউ দেখে না। দেখতে পারে না।
হাঁটতে হাঁটতে থামে। বসে। টেনে নেয় একখণ্ড কাগজ। সাদা। লেখে। ছুটির দরখাস্ত। এক পক্ষ ছুটি। চলে যাবে কোথাও। কিছুদিন। ঘুরে আসবে। প্রিন্সিপ্যাল অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন হেঁটে চলেন আবার। বিষণ্ন হাঁটেন। নিঃসঙ্গ হাঁটেন। হাঁটেন না। হাঁটে। সামনে। সামনে? না পেছনে? কোনটা সামনে আর কোনটা পেছনে? জানে না। শুধু জানে হাঁটা। পথ যেমন একা। সেও একা। পথে পথিক যায়। অথচ সে একা। তুহিনও একা। বড় একা। একা হাঁটে তুহিন পৃথিবীর পথে।
হাঁটে। থামে। তালা। দরজায় তালা। জীবনটাই যেন হাঁটা। থামা। আর তালা। বন্ধ তালা। যার চাবি নেই। চাবিও বন্ধ তালায়। 'ঘরের চাবি পরের হাতে, আমি কেমনে খুলিয়ে সে দ্বার দেখব চক্ষেতে'। তালা না ভাঙতে পারলে তালা খোলার চাবিই যাবে না পাওয়া।
থামে। সামনে বন্ধ তালা। ভাবে। অগত্যা হাত চলে যায় পকেটে। আশ্চর্য! চাবি পকেটেই? পকেটেই ছিল? সে তখন খুঁজে পেল না? এমনও হয় বুঝি? বন্ধ তালা খোলার চাবি পকেটেই থাকে? অথচ খুঁজেই পাই না? এ যেন সেই রকম– 'খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর'। সাফল্যের চাবিকাঠি আমাদের হাতেই থাকে। অথচ ঠিক সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিক জায়গায় প্রয়োগ করা যায় না? চাবিটা বের করে আনে। তালায় ঢুকায়। ঘোরায়। খোলে না। বের করে। ভুল চাবি। তাহলে? খেয়াল হলো– ভুলে চাবি পাল্টে গেছে। একটা আনতে অন্যটা এনেছে। তাহলে কি এরকম ভুল চাবি পকেটে নিয়েই ঘোরে সবাই? এ রকমেরই ভুলে ভরা জীবন? জীবনটা যেন এক ভুলের গোলক ধাঁধা।
আশ্বিন মাস এলেই তার সমস্যা হয়। কেমন পাগল পাগল লাগে সব কিছু। মাথার মধ্যে কেমন কেমন করে। পঞ্জিকার পাতা না উল্টালেও, কেউ বলে না দিলেও, সে টের পায় আশ্বিনের আগমন। আকাশটা পুরো নীল। সারা আকাশে মাঝে মাঝে মাখন ছিটানো মেঘ। উত্তর থেকে মিহি হিম হাওয়া আসতে থাকে বাতাসে ভেসে। কাঁঠাল পাতারা হলুদ হয়ে টুপটাপ ঝরতে থাকে মাটিতে। নদীর তীরে তীরে কাশবালিকারা উল্লাসে হাওয়ায় লুটোপুটি। তুহিন টের পায় । আর শুরু হয়ে যায় মাথার মধ্যে গণ্ডগোল। সব তালগোল পাকিয়ে যায়।
হিমানী ঢুকে পড়ে মাথার ভেতর। সেই কবে যে হিমানীকে সে ফেলে এসেছে মেঘশিমুল গ্রামে, ফাঁক-ফোঁকড় পেলে এখনও সে টুপ করে ঢুকে পড়ে মগজের মধ্যে। সব ওলট-পালট করে দেয়। সারাটা বছর শীতনিদ্রা কাটিয়ে এই আশ্বিনে এসে হিমনী ঢুকে পড়ে তুহিনের মাথার মধ্যে। কী এক অদৃশ্য শক্তি তখন তুহিনকে চালায়, তুহিন নিজেও বোঝে না। তড়িঘড়ি ব্যাগ গুছিয়ে নেয় তুহিন। দূর কোথাও ডাকছে তাকে কিছুদিনের জন্য। চেনা জগৎ থেকে আপাতত ছুটি। 'চেনা দুঃখ, চেনা সুখ; চেনা চেনা হাসি মুখ' থেকে বিদায়।
দূরের সমুদ্র ডাকছে তাকে। মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ। যেখানে কেউ তাকে চেনে না। চিনবে না। এমন কোথও যেতে হবে। সম্পূর্ণ অচেনা কোনো শহরে। অচেনা কোনো সৈকতে। অচেনা মানুষের ভিড়ে। পুরীর সমুদ্র সৈকতই সে জন্য উত্তম মনে হয়। এক দিনের মধ্যে ভিসা করে যাবার জন্য তৈরি।
মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ে একটি কবিতা–

'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
.....
.....

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।'

দুই

দশ লক্ষ সাপের ফোঁসানির মতো সাগরটা ঢুকে পড়ল তুহিনের ঘরের মধ্যে। নাকি বুকের মধ্যে? সাগরের কী পিপাসা? বুক ভরা জল, তবু চিরতৃষ্ণায় কাতর। তৃষ্ণায় চেটে খায় শুকনো বালু। খাতার পাতা ভিজিয়ে দিল সমুদ্র। সুদৃশ্য বাংলোর দক্ষিণের জানালায় বসে লিখছিল কবিতা। ভাবছিল কবিতা–

নায়েগ্রা কিংবা ভিক্টোরিয়ার কথা
বলছি না আমি,
হৃদয়ের কথা বলছি–
তুহিন মেরুতে জমা বরফ যদি গলে,
তবে জলপ্রপাত হবে নিঃসঙ্গ পাথারে;
আমি সেই জলপ্রপাতের কথা বলছি–
এ সময়
ফোঁটা ফোঁটা নিঃসঙ্গতা
জলপ্রপাত ঘটায় কোথাও
উপল প্রান্তরে–
দুর্নিবার আকর্ষণের আলিঙ্গনে
সুখের দোলায় দোলায় জীবন ...
নায়েগ্রা নয়,
নদী অথবা ঝর্ণা নয়,
নয় কোনো অশ্রুবারি,
গোধূলির রক্তরাগে রাঙা
কোনো কিশোরী জলপ্রপাতের কথা বলছি–
সে-ও ঊর্মিমুখর সাগর হবে
হবে মোহনীয় উত্তাল ঢেউ–

কবিতাটাই যেন সাগর হয়ে ঢুকে পড়েছে তার ঘরে। নাকি বুকে? খোলা জানালায় অসীম সাগর। নীল। নীল। দৃষ্টির শেষ সীমায় দিকচক্রবাল। সাগর উঠে গেছে আকাশে। নাকি আকাশ নেমে এসেছে সাগরে? হবে কোনো একটা। তবে দু'জন মিশেছে একই সাথে। অথচ মেশে নি। কোটি কোটি ফারাক। তার মনে হলো– কারও হৃদয়ও এমনই মেশে। দূর থেকে মনে হয় দু'টি হৃদয় মিশে গেছে এক হয়ে। অথচ মেশে নি। মেশে না। দুস্তর ফারাক। ভাবতে ভাবতেই মনে হলো– আকাশসহ সাগরটা ঢুকে গেছে তার ঘরের মধ্যে। জমাট বেঁধে গেছে সাগরের গর্জন। সাথে মিশেছে ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাস।

আশ্বিনের দশ তারিখ। দু'দিন হলো এসছে। পুরী। লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে নির্জন এই সুদৃশ্য বাংলো যেন শুয়ে আছে সি-বিচে। বাংলোটা দু'ভাগের। পুব দিকটা নিয়েছে তুহিন। বাকিটা খালি পড়ে আছে। ভালোই। নিঃসঙ্গতাটা ভালোই উপলব্ধি করা যাবে। রান্নার লোকও রাখে নি। শুধু বাজার করে দিয়ে যাবার জন্য ঠিক করেছে এক লোক। বাজারের সময়ই সে আসবে শুধু। নিজ হাতে রান্না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় 'হল' এ থাকতেই হয়েছে ওঅভ্যাসটা। কেটে গেল নিঃসঙ্গতার দু'দিন। নিঃসঙ্গতা এমন জমাট বেঁধে আছে যেন চামচ দিয়ে কেটে কেটে খাওয়া যায় তাকে। নিঃসঙ্গতা কী? স্মৃতি কি সঙ্গ দেয় নি তাকে? কে তবে নিঃসঙ্গ এ পৃথিবীতে?

বারবার মনে পড়ছে হিমানীর কথা। বারবার কী? প্রায়শঃই। যখনই নিঃসঙ্গ থেকেছে, মনে পড়েছে হিমানীর কথা। যেন নিঃসঙ্গতাই হিমানী। হিমানীই নিঃসঙ্গতা। একে অন্যের পরিপূরক।

কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী হিমানী। গ্রামের কলেজেই পড়ে। তুহিন এম.এ. শেষ বর্ষের ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ 'হল' এ থাকে। এক আকস্মিক পরিচয় তখন, মর্মান্তিক। হিমানীর ভাই শিবেশ ছিল তুহিনের বন্ধু। থাকত পাশের রুমেই।

পৌষের ভোর। গাড়িটা এসে যেখানে থামল, সেখান থেকে মাইল খানেক হাঁটলেই মেঘশিমুল গ্রাম। চারদিকে শীতের কুয়াশা। নিঃশব্দ গ্রাম। অচেনা পথ-ঘাট। সাথে এক থেঁৎলানো লাশ। বাক্সে। ট্রাক-চাপা পড়েছে ঢাকার রাস্তায়। আবার ট্রাকে করেই ফিরল বাড়ি। লাশ হয়ে। তুহিনের বন্ধু শিবেশ। স্টেশন থেকে দু'জন লোক সংগ্রহ করে বাক্স কাঁধে তারা চলল। উদ্দেশ্য মেঘশিমুল। মোরগ ডাকার আগেই পৌঁছাল তারা। সুখের নিদ্রা কেড়ে নিয়ে দিতে হবে এই মর্মান্তিক খবর। কী করে তার বাবা-মাকে বলবে– এই তোমার ছেলের লাশ? ভাবতে ভাবতে

দরজায় কড়া নাড়ল। একটা কাশি দিয়ে উঠে এল এক বয়স্ক পুরুষ। 'কে'– বলে দরজা খুললেন। তুহিন– আপনি কি শিবেশের বাবা?

আগেই হয়ত খবর পৌঁছে যায় বাবা-মার মনে। সন্তানের দুঃসংবাদ আগেই টের পেয়ে যান বাবা-মা। ভদ্রলোক– হ্যাঁ, কেন, কী হয়েছে? আমার শিবেশের কিছু হয় নি তো? এত ভোরে, নিশ্চয়ই কোনো খারাপ খবর? তুমি কে বাবা? তুহিন নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকল। কী বলবে ভেবে পেল না। বহু কষ্টে জিভ ঠেলে বেরুল– 'এ্যাক্সিডেন্ট'। এই একটিমাত্র শব্দ সেদিন ভূ-কম্পন ঘটিয়েছিল। –কোথায় আমার শিবেশ, কোথায়? ছুটে যান উঠোনে। নামানো বাক্সের কাছে। চেতনা রহিত হয় তাঁর। থ'মেরে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। নিঃশব্দ। শিশিরের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না তখন। বিশ্ব চরাচর যেন স্তব্ধ কিছুক্ষণ। নিশ্চুপ।

পরে বলেলন– বেরুবি না বাবা শিবেশ, ওঠ, ভোর হয়েছে যে?

সহসা উঠে পড়ে। ঘরে আসে। ডাকে– ওগো ওঠো, এখনো ঘুমিয়ে আছো? দেখো, তোমার শিবেশ এসেছে। হিমানী, ওঠ মা, তোর দাদা এসেছে, ওঠ। বলতে বলতে কেঁদে দিলেন। ধড়মড় করে উঠে বসে দু'বিছানায় দু'জন। একজন শিবেশের মা। অন্যজন বোন, হিমানী। কতদিন পর ছেলে বাড়ি এল। কতদিন পর দাদা বাড়ি এল। 'দাদা এসেছে' বলে ছুটে এল হিমানী। 'শিবেশ' বলে ছুটে এল মা। 'কোথায়' বলে তাকিয়েই চিৎকার। সেই ছিল তার মার শেষ চিৎকার। জ্ঞান হারাল। আর ফিরল না। পৌঁছতে পারল না ছেলের কাছে। নাকি ঠিক পৌঁছেই গেল? 'দাদা' বলে বাক্সের ওপর ভেঙে পড়ল হিমানী। তুহিনরা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ধরাধরি করে মাকে নেওয়া হলো ঘরে। নিথর। উষ্ণতা আছে। প্রাণ নেই। বাবার চোখে সাহারা। তখনও জানে না হিমানী– উঠোনে ভাইয়ের লাশ; আর ঘরে মায়ের।

ভোরের আলো ফোটার আগেই যেন কুয়াশা গাঢ় হয় বেশি। একাকী কাঁদছে হিমানী। সান্ত্বনা দেবার নেই কেউ কাছে। তুহিন এগিয়ে গেল। আস্তে করে হাত রাখল মাথায়। কোনো কথা নয়। কথা থাকে না এসময় । না কথাই যেন অনেক কথা বলে। দেয় অনেক সান্ত্বনা। বাক্স ছেড়ে হাউমাউ করে জড়িয়ে ধরল তুহিনকে। এবারে তুহিন গলল। নিঃশব্দে দু'চোখে বেরিয়ে এল অশ্রু। তরল বেদনা। তুহিন ভেবে পায় না ঘরের মর্মান্তিক খবরটা জানাবে কী করে ওকে? কিছুক্ষণ কাটার পর এভাবে হঠাৎ নিজেকে কুয়াশার মধ্যে আবিষ্কার করে তুহিন। দু'বাহুর আলিঙ্গনে তার বুকের সাথে পায়রার মতো আবদ্ধ এক তরুণী। বুকের নরম উষ্ণতা লেগে আছে তার বাহুতে। হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে তুহিন। কেমন আড়ষ্টতা এসে যায়। আর কেউ নেই সেখানে। সবাই ব্যস্ত ঘরে। এ কেমন নির্জনতা। ছেড়ে দেবার জন্য উসখুস করে। কিন্তু পারে না। যে ছাড়া পেতে না চায়, তাকে কী করে ছাড়া যায়? পরম নিশ্চিন্তে নিজেকে সঁপে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে হিমানী। কী করে ছেড়ে দেবে তুহিন? বরং থাক, নিভৃতের নিঃসঙ্গতায় শোকের সাগরে।

কুয়াশা কেটে যায়। আশ্চর্য! সূর্যের রক্তচক্ষু দেখে কুয়াশা কখন পালায়, কোথায়, টেরই পাওয়া যায় না। কুয়াশা চলে যেতেই অশ্রুর সুর শুনে ভেজা পথে চলে এল অগণিত প্রতিবেশী। ভেঙে পড়ল গোটা গ্রাম। মেঘশিমুল গ্রামে মেঘের ছায়া। বেদনার মেঘ। বেশি ভালোবাসা থেকেই বেশি বেদনার উৎপত্তি। পাশাপাশি জ্বলল দু'চিতা। মা ও ছেলে। আর দু'চিতার হাহাকার নিয়ে দু'জনে সাজিয়ে রাখল জীবনের দু'চিতা। বাপ ও মেয়ে।

অনেক কান্নার পর, অনেক কষ্টের পর বিদায় নিতে পেরেছিল তুহিনরা। তুহিন চলল, কিন্তু কী এক আকর্ষণ পেছন থেকে টানছে তাকে। অশ্রুল দু'চোখের করুণ দৃষ্টি যেন পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে আছে তাকে। ঢাকা পৌঁছে সান্ত্বনা দিয়ে এক চিঠি লিখেছিল হিমানীকে। সে চিঠির ঠিকানা বেয়ে এল হিমানীর চিঠি। মনে পড়ে তুহিনের, সেদিন বহু কষ্টে বলেছিল– কেঁদো না। ভাবো না কেনো, আমিই তোমার হারানো দাদা। ওই একটি কথা যেন আরও বেশি তুলল বেদনার ঝড়। আর ওকথাটাই হলো জীবনের ভুল সংলাপ।

এর মাসখানেক পর আবার আসতে হয়েছিল তুহিনকে মেঘশিমুল গ্রামে। গ্রামের যুবকদের আমন্ত্রণে। ভালোবাসার টানে সংঘের যুবকরা গ্রামে একটা পাঠাগার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিবেশের নামে। এক শোকসভার মাধ্যমে উদ্বোধন করা হবে পাঠাগার। আসতে হবে তুহিনকে।

সেবারে এসে দু'দিন ছিল হিমানীদের বাড়ি। হিমানী যেন নিজের দাদাকে পেল ফিরে। সারাক্ষণ কাছে কাছে, পাশে পাশে। ঘুমুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। শোকটাও যেন একটু থিতিয়ে এসেছে তুহিনকে পেয়ে। তুহিনও জড়িয়ে পড়ল কেমন এক মায়ায়।

কী বার ছিল সেদিন, মনে নেই। স্থানীয় হাইস্কুলে সকাল দশটায় ছিল স্মরণ সভা। এলাকার বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন উপস্থিত। এলাকার অধিকাংশ যুবকরাই উপস্থিত ছিল সেদিন অনুষ্ঠানে। এক সময় তুহিনকে দাঁড়াতে হলো কিছু বলার জন্য। বলা শেষে শিবেশকে নিয়ে যে কবিতাটা লিখেছিল, সেটি; পকেট থেকে বের করে একটা কাগজ, ভাঁজ খুলে পড়ল। তারপর বসতে বসতে চোখ মুছল রুমালে। কবিতাটার শিরোনাম ছিল– 'একদিন হারিয়েই যাই যদি'। মনে আছে এখনও প্রতিটি লাইন। কারণ, কবিতাটা ছিল জীবন ছেনে আনা যন্ত্রণার মসলায় তৈরি এক অপূর্ব রাগিণী। অনুষ্ঠান শেষে হিমানী চেয়ে নিয়েছিল তা। কবিতাটা এরকম ছিল–

ধরো, এই মাঠ ধসে গেল একদিন
নদীর ভাঙনে
এই পথ, এই গাছ শেষ হলো–
কোনো পথিক আর শুনবে না পাখিদের গান
এই পথে যেতে যেতে কোনো সন্ধ্যায়–
এই পথে ফিরবে না কোনো রাখাল
বাঁশিতে তুলে নীল পূরবীর সুর
গোধূলিবেলায় তার গরুর পাল লয়ে,
কোনো পথিক ক্লান্তি ঝরাবে না
এই বটের ছায়ায়,
প্রতীক্ষায় থাকবে না কেউ এই অলস বিকেলে।

ধরো, আমিও নেই–
হারিয়ে গেছি ওই আকাশের বুকে
এই উধাও মাঠের মতো–
ঘাসের শীষের দু'বিন্দু শিশিরের মতো
কারো চোখে জমবে না অশ্রু,

ধরো,
যদি হারিয়েই যাই কোনো একদিন–
কোনো চিঠি আসবে না এই নীড়ে,
দীর্ঘশ্বাসের পায়রা উড়বে না আমার আকাশে
সূর্যের চোখ থেকে ঝরবে না বিস্ময়রাশি
নিশ্চল হবে না স্রোত নদীতে নদীতে
শেষ হবে আনাগোনা এই পথে,
আমার দুয়ারে,
বাজবে না কোনো সুর
কোনো দিন, কোনো ক্ষণে,
ধরো, একদিন হারিয়েই যাই যদি–

সেবার বেশ করে লিখেছিল হিমানী তুহিনকে আসতে। পুজোয়। এক সপ্তাহ থাকতে হবে। দাদা থাকলে তো আসত? তুমি কেন আসবে না? তুমিই তো আমার দাদা! এ দাবী উপেক্ষা করতে পারে নি তুহিন। কাকাবাবুর জন্য একটা পাঞ্জাবি, আর হিমানীর জন্য খয়েরি কাতান। পৌঁছাল এসে অধিবাসের সন্ধ্যায়। সেদিনও ছিল এমনই শরৎকাল। বাতাসে আশ্বিনী গন্ধ। গ্রামের সন্ধ্যা। সন্ধ্যার আকাশ। লাল আভাটুকুও গেছে মিলিয়ে। মাঠ থেকে বেশ খানিকটা উপরে সরের আস্তরণের মতো কুয়াশা। ভাসমান। কোনো বাড়িতে রান্না হচ্ছে। ধোঁয়া এসে মিশেছে কুয়াশায়। ঢাকের বাজনা। ধূপের গন্ধ। সব মিলিয়ে মনে করিয়ে দেয় সেই ছেলেবেলার পুজোর সন্ধের কথা। নাম পরিচয় না জানা মেয়েটার কথা। প্রথম প্রণয়ের কথা। পুজোতেই ঘটে নাকি যত প্রেমের উন্মেষ?

মন খারাপ করে বসেছিল হিমানী। গতকাল আসার কথা দাদার। অথচ এল না। নিজের দাদা হলে কি না এসে পারত? ছোট্ট একটা অভিমান এসে বসে থাকল চোখের পাতায়। ছোট্ট এক খণ্ড কষ্ট ঠাণ্ডা একখণ্ড বরফের মতো আটকে থাকল বুকে। একটু উত্তাপ, একটু উষ্ণতা পেলেই গলবে। ঝরবে। বেরিয়ে আসবে চোখের কিনারে। মন খারাপ। এভাবে নষ্ট হবে এই আনন্দ? গতবার পুজোতেও দাদা ছিল। আর আজ নেই! আর এক দাদা হলো। সেও আসবে বলে এল না। উঠে আলো জ্বালাতেও ইচ্ছে করছে না। কী হবে আলো জ্বেলে? বাবা ফেরে নি এখনও ঘরে। অন্ধকারের যেন একটা নেশা আছে। মনে হচ্ছে ঘরের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দাদা। কেমন গা ছমছম করছে। অথচ ভালোও লাগছে ভাবতে। নিঃশব্দ ঘর। দূরে শুধু বাজছে পুজোর ঢাক। আর ভেতরটা কেবল হাহাকার করে উঠছে হিমানীর। এলই না তাহলে? তবে যে লিখল আসবে!

হিমানীর দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছে তুহিন– ওরা কি কোথাও গেছে তাহলে? ঘরে বাতি নেই কেন? তাহলে এখন? একটু খেয়াল করে দেখল তালাবদ্ধ নয়। বাড়িতেই আছে কোথাও। ঘরেও তো থাকতে পারে? না, অন্ধকারে ঘরে কী করবে? তবে? কী ভেবে কড়াটা নাড়ল তুহিন।

হঠাৎ চমকে উঠল হিমানী। ধক্ করে উঠল ভেতরটা। নিস্তরঙ্গ ভাবনায় যেন টুপ করে একটা ঢিল পড়ল। আস্তে উঠে দরজাটা খুলল। বাতি জ্বালার কথা মনেই হয় নি। সময়ই বা কোথায়? দরজায় দাঁড়িয়ে 'কে' বলতে গিয়েই বলে উঠল– দাদা! ওদিক থেকে ব্রিফকেস বাঁ হাতে তুহিন বলল– কেমন আছ হিমানী? তার আগেই কোমল দু'টি বাহুবন্ধন বিহ্বল করে দেয় তুহিনকে। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকল নিশ্চল। বুকে মুখ ঘষতে থাকে হিমানী– এলে তাহলে? আমার না কী কষ্ট হচ্ছিল? ডান হাতটা উঠে আসে হিমানীর কাঁধে। গভীর মমতায় করে সোহাগ। হিমানীর বুকের বরফ খণ্ড গলল। চোখে অশ্রু ঝরল। ভিজল তুহিনের বুক। আশ্বিনী অন্ধকার হয় এত মধুময়, জানা ছিল না তুহিনের। হিমানী কি তার বোন? হিমানী কি তার বোন নয়? এ দু'দ্বন্দ্ব মনের মাঝখানে বইয়ে দিল চিকন এক শীতল স্রোত। অন্ধকারই যেন মোহনীয় করে তোলে এমন মিলন। এমন ভাবনা। 'চল ঘরে' বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তুহিনকে। সে যেন নিশ্চল রথের চাকা। হিমানী টানছে। সে সচল হচ্ছে। ঘরে গিয়ে চৌকিতে বসল দু'জন পাশাপাশি। ঘেষাঘেষি। তুহিনের একটা হাত কোলে নিয়ে কথা বলছে হিমানী– এত দেরি করলে কেন? কাল না আসার কথা ছিল? বা রে আমার বুঝি কষ্ট হয় না? আমি রাগ করেছি। তুমি দেরিতে এসেছ বলে আমি আলোও জ্বালব না এখন। দেরিতে জ্বালব।

কী করে বোঝাবে তুহিন এ ভ্রাতৃস্নেহকাতরা বালিকাকে তার চেতনার প্রান্তর চিরে এখন বইছে এক চিকন স্রোতের নদী? তার এপাশে বোন। ওপাশে প্রণয়িনী। কখন সৃষ্টি হলো এ ঠাণ্ডা স্রোতের? প্রণয় কি এরকমেই সৃষ্টি হয়ে যায়, যে টেরই পাওয়া যায় না? যখন টের পাওয়া হয়, তখন সরু সুতোর মতো স্রোতটা নদী হয়ে যায়। তির্‌তির্ উৎসের ধারাটা কখন হয়ে যায় বিপুল বিপাশা। হিমানীকে ছোঁয়ায় কেমন একটা আড়ষ্টতা আসে তুহিনের। অথচ হিমানীর তো আসে না। সে তো কী গভীর মমতায় দু'হাতে জাপটে ধরে শিশুর মতো। তুহিন কেন পারে না? কেন তার মনে কাজ করে হিমানীর দ্বৈত সত্ত্বা? গোটা হিমানীই যেন আকাশ আর সাগর হয়ে মিশে যায় তার চেতনার দিগন্তের সীমানায়? এরকম কি তারই হয়? না অন্যেরও হয়? হিমানী কি তা বুঝতে পারে? একজন দর্শনের অধ্যাপককে প্রশ্ন করেছিল তুহিন এ বিষয়ে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন– 'এ সবার ক্ষেত্রেই হতে পারে। একজনের ক্ষেত্রে হলো। অন্যজনের ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, দু'টো যুবক-যুবতীর ভেতর উভয়েরই হলো। কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়। এ হলো মানব মনের ব্যাপার। ফ্রয়েড পড় নি?' এ জানার আগে সামান্য পাপবোধ কাজ করত তুহিনের মনে। এরপর আর তা থাকল না। এ হলো মনের স্বাভাবিক আচরণ। তবুও এ আচরণকে প্রকাশ করতে পারল না সে। দ্বিধা এল। 'অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া; খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে। একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে; ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী'। তুহিন বুঝতে পারে না সম্পর্কের এ নিগূঢ় রহস্য। এ কেমন প্রণয়কলা? হিমানী তো তাকে দাদা বলেই জানে। সেও তো বলেছিল– 'ভাবো না কেন, আমিই তোমার হারানো দাদা?'

পরদিন বিকেলে বেরুল দু'জন নদীর তীরে। নদী দেখতে। হাওয়া খেতে। কাশের হাওয়া। আকাশ নীল। দু'এক জায়গায় সামান্য সাদা। মনে হয় মাখন খেতে খেতে কোনো বাচ্চা ছেলে কিছুটা ছিটিয়ে দিয়েছে আকাশে। সূর্যটা নরম হয়ে আসছে। গলবে আর একটু পরেই। হাওয়ায় হেসে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে ধবল কাশ। মনে হয় বিধবার হাসি।

– 'বিধবার বুকে এত হাসি থাকে?' সাদা কাশ দেখিয়ে হিমানীকে বলেছে তুহিন। হিমানী বলেছিল– দাদা, তুমি যে কী? কাশ কেন বিধবা হবে?

– দেখো না, কেমন বিধবার সাজে সেজেছে শ্যামলী? পায়ের কাছে তার প্রণয় বারি, ওই নদী।

হিমানী বলেছিল– তুমি পারও ভাবতে? আমার ওসব ভাবনা-টাবনা আসে না। দেখতে ভালো লাগে, তাই দেখি। দেখো দাদা, সূর্যটা কী সুন্দর! ডুবে যাচ্ছে। সুন্দর হওয়ার সময় হলেই বুঝি ডুবে যায়? কেন, আর কিছুক্ষণ থাকলে কী হয়?

– সুন্দর ক্ষণস্থায়ীই হয় হিমানী।

এ সময় সাঁই সাঁই করে এক ঝাঁক কী পাখি উড়ে গেল উপর দিয়ে।

– দেখো, কী সুন্দর!

– ওই তো ক্ষণস্থায়ী! তুমি কি ওই সূর্যাস্তকে সূর্যাস্তই দেখো? আর কিছু দেখো না হিমানী?

– না। তুমি?

– দেখি। দেখি অন্যকিছু। ওই সূর্যটা ডোবে। কিন্তু আকাশ রাঙিয়ে। আকাশের বুক থেকে ঘটায় রক্তক্ষরণ। সূর্যটা যদি আকাশের হৃদয় হয়, তবে ওই লালাভা তার রক্তরাগ। ওখানে বেদনার রঙ আছে লেগে। কোনো কোনো আশা এমনই ডুবে যায়। শুধু রাঙিয়ে দিয়ে। লক্ষ্য করেছ, ওই লাল আভার ভেতর একই সাথে মিশে আছে লাল আর

কালো। শেষে সবই চলে যাবে কালোর অধিকারে। এ পৃথিবীতে অন্ধকারই বুঝি সত্য। সেই জীবনানন্দের কবিতার মতো–
'সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী–
ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকার–'
নবমীর দিন। বসে আছে কাঁঠালছায়ায়। মাদুর বিছিয়ে। টের পাওয়া যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়, এমন হাওয়া বইছে উত্তর থেকে। মিহি হিমের ছোঁয়া। হলুদ দু'একটা কাঁঠালপাতা মাঝেসাজে পড়ছে ঝরে। বাইরে টনটনে দুপুর। দুপুরের রোদ। ঝিমধরা মাঠ। মৌন আকাশ। নীল। তার বুকে দূরে, ওড়ে এক বিন্দু চিল। বসে গল্প করছে তুহিন আর হিমানী। নিস্তব্ধ চরাচর। এমন সময় তুহিন– বুঝি পছন্দ হয় নি তোমার শাড়িটা, তাই না হিমানী?
– কেন, তোমার বুঝি তাই মনে হয়েছে?
– তবে পরো নি কেন একবারও?
– সময় হয় নি গো এখনও! সময় হলেই পরব। সেজন্যই তুলে রেখেছি।
গাঢ় অন্ধকারে এক বিন্দু জোনাকির মতো তুহিনের মনে একটু আলো জ্বলল। কী বলতে চাইছে হিমানী 'সময় হয় নি গো' বলে? কোন্ সময়ের কথা বলছে সে? তবে কী সে টের পেয়েছে তার মনের গোপন কথাটুকু? আকাশের চিলটা যেন পাক খেয়ে নেমে এল নিচে। এসে বসল তুহিনের বুকের ডালে। পাঁজরের হাড়ে। 'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে; তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।' চিলের ডানার শুকনো পালকের হাওয়া লাগল তুহিনের বুকে। আর কোনো কথা নয়। এবার নৈঃশব্দে শুধু কল্পনা বোনা। কী আছে আকাশের নীলের ওপারে, কে জানে?
পরদিন বিজয়া দশমী। বিসর্জনের ঢাক বাজল বুক ফাটিয়ে। ঝরল অশ্রু মন্দিরে মন্দিরে। কান্নার, বিদায়ের অশ্রু গড়িয়ে বিকেল এল। নতুন পোশাক পরে হিমানী এসে বলল– কই এখনও প্রস্তুত হও নি? বেলা যে পড়ে এল? দশোহরায় যাব কখন? চল, ওঠো শীঘ্র।
কত সহজেই তুহিনকে 'তুমি' বলে হিমানী। অনায়াসেই ধরে হাত। হাসতে হাসতে ঢলে পড়ে বুকে। কিন্তু তুহিন পারে না। আড়ষ্টতা আসে। হিমানীর ছোঁয়ায় যেন আরও হিম হয়ে যায় তুহিন। কেমন এক শিহরণ খেলে যায় দেহে। মনে। 'তুমি' বলে। কিন্তু এ যেন কেমন 'তুমি'। বহু চেষ্টা করেও 'তুই' বলতে পারে নি হিমানীকে। বললেই বলা যেত। বলা যায় নি। বলা হয়ে ওঠে নি। কেমন এক অনুভূতি এসে ভর করে জিভে। সহজ হতে পারে নি। অথচ হিমানী তাকে তার নিজের দাদা ভাবে। মেশে সেভাবেই। সে কেন পারে না সহজ হতে? কোথায় যেন এক সংশয়, এক সঙ্কোচ নিঃসঙ্গ ভেসে থাকে শরতের আকাশের নীলে। দূরে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তা যেন ঐ নিঃসঙ্গ সংশয়ী চিল। ভেসে থাকে গনগনে আকাশের নীলে। শূন্যে। শূন্যে।
আড়ং। রঙ বেরঙ। কত লোক। হৈ চৈ। কত নৌকা। ভাসছে ঢেউয়ের বুকে। নাগরদোলায়। নদীর দোলায়। ছলাৎ করে রসিকতা করল জল। পাশের নৌকার গায়ে আঘাত হেনে ঢেউ উঠে এল তুহিনের গায়ে। লাগল মুখে। 'এ মা' বলে হেসে কুটি কুটি হিমানী বুকের আড়াল থেকে বের করে আনল সুগন্ধি রুমাল। সযত্নে মুছিয়ে দিল তুহিনের মুখ। কত সহজে। কত অনায়াসে। তুহিন আড়ষ্ট হলো। সংকোচ এসে জমল দুরুদুরু বুকে। জনারণ্য চারদিকে। পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান; জিলাপির দোকান; খিলি পানের দোকান; বাঁশির শব্দ; লোকজনের চিৎকার; নৌকা বাইচ, টিকারা বাজানোর শব্দ; সারি গান; সব মিলিয়ে এক হুলস্থুল কাণ্ড। হিমানী বায়না ধরল খিলিপান খাবে। সবার জন্য কিনল। তুহিনও একটা খেলো। মুখে পান পুরে চিবোন দিয়েই হিমানী উঃ আঃ করে উঠল– মাগো, কী ঝাল! পুড়ে গেল, আমার মুখ পুড়ে গেল। চোখে জল এসে যায় হিমানীর। হিমানীর ঠোঁট দু'টো রক্ত রাগে রাঙিয়ে দেয় পানের রস। টকটকে লাল। এই হিমানীকে তার অন্য রকম লাগে। অন্য রকম সুন্দর।
ভেজা ভেজা জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে আড়ং থেকে ফিরছে তুহিন। টিকারা বাজিয়ে জারি-সারি গান গেয়ে ফিরছে মানুষ। জল আর বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ মিতালি তুহিনকে ডেকে নিয়ে যায় কোন এক অচেনা স্বপ্নপাড়ায়। তুহিনের গা ছুঁয়ে হিমানী বড় বেশি রকম চুপ। ভালো লাগে এই মোহনীয় নীরবতা। এই মৃদু জ্যোৎস্নায় কোনো রঙই স্পষ্ট নয়। জলের রঙ, ধানক্ষেতের রঙ, হিমানীর ঠোঁটের রঙ, সব এক হয়ে যায়। তুহিনের খুব ইচ্ছে হয়, আলতো একটু ছুঁয়ে দেখে হিমানীর ওই পানের পরাগ মাখা রক্তিম ঠোঁট। পারে না। ইচ্ছে তো ডানা-ভাঙা পায়রা।
এই সুন্দর রাত, সুন্দর চাঁদ, হিমানীর ছোঁয়া, স্বর্গীয় আবেশ আনে মনে। মনে হয়, শুধু কষ্টই নয়, সুখও আছে পৃথিবীতে অনন্ত অনন্ত। এ মুহূর্তে খুব সুখী সুখী লাগছে নিজকে। এক আকাশ সুখ নিয়ে ফেরে সে হিমানীর বাড়ি। কিন্তু এই সুখের মধ্যেও কোথায় যেন কাঁটার মতো বিঁধে থাকে এক কষ্ট। কোথায়, কেন, তা সে জানে না। ফুলের ভেতরও কীট থাকে। মালাতেও থাকে কাঁটার আঘাত। এই এক ভয় সারাক্ষণ তার সুখের ঘরে দেয় অশুভ হানা। তাই সুখের ভেতরও অজানা কষ্ট তুহিনকে ম্লান করে রাখে অহর্নিশি। কী এক সংশয় তাকে মেঘলা আকাশের মতো

ঘিরে থাকে সারাক্ষণ। কী এক অদৃশ্য ইশারা তাকে ডাক দিয়ে যায় বারেবার। আলো, কি আলেয়া, জানে না তুহিন।
বাইরে খাঁ খাঁ জ্যোৎস্না। ধারাল। বাতাসে বিষাদের ঘ্রাণ। বিজয়ার রাত। হাসনাহেনা ফুটেছে কোথাও। নাকি শিউলি? বাতাসে তার ঘ্রাণ। ঘুমিয়েছে পাখিরা। জাগে রাত। জাগে চাঁদ। চাঁদের উঠোনে পায়চারী করছে তুহিন। চুড়ির মৃদু আওয়াজ তুলে স্মিতমুখে হেঁটে আসে হিমানী। পরনে খয়েরি কাতান। হাতে চুড়ি। কাচের। সবুজ। স্বপ্নীল। অপরূপ লাগছিল তুহিনের। এই নৈসর্গিক প্রকৃতি। এই সাজে সাজা হিমানী। পুরো প্রকৃতিই মনে হয় হিমানী। মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তুহিন। খিল খিল হিমানী– দাঁড়াও গো, দাঁড়াও, বিজয়ার প্রণামটা সেরে নিই আগে। প্রণাম শেষে উঠে দাঁড়াতেই তুহিন দুহাতে বুকে ডেকে নেয় হিমানীকে। গভীর মমতায় হিমানী সঁপে দেয় নিজেকে।
তুহিন বলে– হিমানী, বড় সুন্দর লাগছে আজ।
হিমানী– প্রতি বিজয়াতেই দাদার দেয়া নতুন পোশাক পরে প্রণাম করতাম দাদাকে। আজও করলাম। এজন্যই এতদিন পরি নি। এবার ভেঙেছে তো অভিমান? বাব্বা, সে কী রাগ? খুব সুন্দর হয়েছে শাড়িটা।
হঠাৎ মনে হলো তুহিনের– কী বলে এ কণ্ঠস্বর। যতটুকু আশার ফুলকি উড়েছিল আকাশে, এক মুহূর্তে তা গেল মিলিয়ে। 'সময় হয় নি গো'র মধ্যে যে আশার আলো ছিল, নিভে গেল তা এক ফুঁৎকারে। হিমানীর আর কোনো কথা কানে যায় নি তুহিনের। অথবা গেছিল। মনে করে নি প্রবেশ। কেমন বিবশ হয়ে এসছিল তুহিনের চেতনা। হিম হয়ে এসছিল যাবতীয় বোধ। এমন কেন হয়? বাইরে জমাট বেঁধে আসে জ্যোৎস্না। বুকে হিমানী যেন একখণ্ড হিমেল বরফ। গলে না। জমাট বরফ বুকে নিঃসঙ্গ তুহিন পাথরের মতো অনড় অনন্ত অনন্ত কাল।

তিন

ঝাউবনে ঝড় ওঠে হঠাৎ। আকাশ আর সমুদ্র ঢুকে গেছে ঘরের ভেতর। মেঘও। মেঘশিমুলের মেঘ। না। জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না। লাগুক যত পারে ঝড়ের ঝাপটা। উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে সমস্ত কাগজ। নাকি তার মন। ভিজিয়ে দিচ্ছে সমস্ত লেখা। নাকি তার মন। সাগর এসে ঢুকে গেছে মনের ভেতর। ঝড় থামে না। ঝড় চলে। চলতে চলতে একাকার হয়ে যায় সাগর আর ঝড় আর ঘর। তুহিন নিজেও যেন ঝড় হয়ে যায়। ভুলে যায় রান্না খাওয়া। ইচ্ছে হয় না রান্না করতে। অনেকক্ষণ পর থামে ঝড়। থামে না মনের ঝড়। চলে। চলে স্মৃতির সাথে। পাউরুটিতে মাখন মিশিয়ে খেয়ে নেয়। সাথে দু'টো সাগর কলা। সিদ্ধ ডিম ছিল। আর ফ্লাস্ক থেকে গরম এক কাপ কফি। আবার এসে বসে জানালায়। বৃষ্টির কুয়াশায় আর্দ্র টেবিল। ইচ্ছে হয় না তার মুছতে। কেমন এক অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে মন। টেবিলের উপর এসে পড়েছে এক ফোঁটা রুপা। রুপা নয়। চাঁদ। আকাশে উঠেছে চাঁদ। বৃষ্টি ভেজা। ঝকঝকে চাঁদ। নির্মেঘ আকাশ। অথচ একটু আগে ঝড় ছিল। ছিল মেঘ। এই ঝড়। আবার এই একখানা মিহি নীল আকাশ। জীবনটাই যেন রৌদ্র-মেঘের খেলা।

মনে পড়ে তুহিনের। মনে পড়ে সব। সেই পুরনো স্মৃতি। সেই হিমানী। মনে আছে। বায়না ধরল হিমানী– যাওয়া হবে না তোমার শীঘ্র। লক্ষ্মীপুজো শেষ হলে তবে যাবে। ইচ্ছে হয় বলে দেয়– না হিমানী, আজই– এ রাতেই– এখনই চলে যাব। ইচ্ছে হয় চলে যেতে। পারে না। কী এক দুর্বোধ্য ব্যথায় পাথর হয়ে আসে পা। হৃদয়। চোখ। দৃষ্টি। এক মুহূর্তও আর ইচ্ছে হয় না থাকতে। বিষাক্ত মুহূর্ত। মুহূর্তগুলো যেন সাপের নিশ্বাস। মৃত্যুনেশা। নিথর হয়ে থাকে তুহিন। এ যেন স্বপ্নের যাওয়া। ছোটে তবু চলে না তার পা। বিষাক্ত মুহূর্ত কাটে বিষের নেশায়। অবশেষে সপ্তাহ পরে আসে সেই লক্ষ্মীপুজোর রাত। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। শরতের শেষ রাত।

সন্ধের আগেই হিমানী তুহিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল নদীর তীরে। মন্ত্রমুগ্ধ কুয়াশায় আচ্ছন্ন তুহিনের চেতনা। সূর্যাস্ত দেখাবে ওকে। শরতের শেষ সূর্যাস্ত। কাশের ঝরা। মরা নদীর ক্লান্ত স্রোত। আর দেখাবে– আকাশের বোঁটা থেকে ঝরে যাবার আগে বেদনায় কেমন রাঙা হয়ে ওঠে সূর্যের হৃদয়। দু'চোখ ভরে তুহিন দেখল সব আচ্ছন্নের মতো। চিতায় মাটির উপর যেমন পুড়ে পুড়ে গলে গলে ঝরে পড়ে শবদেহ আগুনের সাথে; তেমনি লাল সূর্য গলে গলে যায়।

হঠাৎ হাত ধরে হিমানী বলে– কথা রাখবে একটা? খুব শখ ছিল সারারাত এই দিন দু'জনে থাকব জ্যোৎস্নায়। নৌকায়। পাথারে। ঘুরব। জেগে রব ঘুমহীন এই কোজাগরী রাত। শুধু এ রাতের জন্যই থাকিয়েছি তোমাকে। ইচ্ছে হয় এখনি বলে 'না'। যাব না। যাব না ওই জ্যোৎস্নার তলে। যাব না নক্ষত্রের আগুন ভরা রাতে। 'যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত লাগিতেছে আমার শরীরে।' কী এক অজানা ভয় ছুঁয়ে থাকে তাকে। মন যেতে চায়; প্রাণ চায় না। পারে না। পারে না উপেক্ষা করতে আহ্বান। অভিভূতের মতো বলে– তোমার খুশি।

অভিমানী মেঘ জমে হিমানীর চোখে। বৃষ্টি ঝরায় না। শব্দ করে না। নিথর হয়ে থাকে। বলে– 'আমার খুশি! ঠিক আছে, যাব না, তোমার ইচ্ছে না হলে।' বিব্রত বোধ করে তুহিন। বুঝে উঠতে পারে না; কী করা সম্ভব। হিমানীর বাঁ হাত লুফে নেয় তুহিন দু'হাতে। বলে– 'আমার কি ইচ্ছে হয় না হিমানী, ওই চাঁদের তলে যেতে? কিন্তু, কেন যেন ভয় হয়, ও হয়ত জ্যোৎস্না নয়, খাঁ খাঁ আগুন। জঙলি জ্যোৎস্না। ইচ্ছের পায়রারা যদি পুড়ে হয় ছাই? ভয় হয়। তবুও যাব আমি। যাব। যাব ওই আগুনের তলে। আবৃত্তি করে ওঠে তুহিন–

যাব আমি
যদি বলো,
তুমি যদি বলো–
যাব আমি চাঁদের আগুনে
মৃত্যু-শীতল হিমেল হাওয়ার শাপলার বনে;
যদি বলো
যেতে পারি, সাহারা কিংবা সমুদ্র গভীরে
ইউরিডিসির খোঁজে পাতাল-পুরীতে,
যদি বলো, যাব আমি নক্ষত্রের নীলে
ইচ্ছে তো হয়, উড়ি আমি স্বপ্নীল পাখায়
পারি না;
ইচ্ছে আমার এক ডানা-ভাঙা পায়রা
তবুও যাব আমি অগম্য আকাশে
যদি বলো– যাব আমি– যাব

চাঁদ-ফুল-তারার আগুনে
যদি বলো– পতঙ্গ হব এই
পার্থিব পাখায়
যদি বলো– যাব আমি– যাব
যাব–
অনন্ত আগুনে–

শঙ্কিত চোখে হিমানী তাকায়। বুঝে উঠতে পারে না, কী বলে তুহিন। চোখের কোণে জমে দুর্বোধ্য ব্যথার শিশির। তবুও খুশি হয়। তুহিন রাজি হয়েছে যেতে। বলে– 'তুমি যাবে তাহলে দাদা? কী যে ভালো হবে? তুমি অমন করে কথা বলো কেন তাহলে? আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমার বুঝি কষ্ট হয় না?' তুহিন বলে– 'আমারও কি কষ্ট হয় না?' মনে মনে ভাবে– 'আমার তো গেলেও কষ্ট, না গেলেও কষ্ট। এ কেমন কষ্ট?' এরকম কোনো কোনো কষ্ট বুঝি থাকে জীবনে, যার অর্থও বোঝা যায় না। শুধু বোঝা যায় কেমন এক শূন্যতা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে জমে থাকে শ্বাসনালীতে। আর হাহাকার করে ওঠে হৃদয়ের হাওয়া। সবার মাঝে থেকেও কেমন কষ্টক্লান্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে তুহিন। এ যেন তার কষ্ট-বিলাস। নিঃসঙ্গতা-বিলাস।
সুন্দর একটা Music বাজল দেয়াল ঘড়িতে। তারপর মোলায়েম মহিলা কণ্ঠে বলে উঠল– It's twelve o'clock at night। আকাশে আবার সেই চাঁদ। তিন বছর পরের চাঁদ। দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে আসে তুহিন। সৈকতে হাঁটে। নির্জন বালুকাবেলা। ঝাউ আর সাগরের দীর্ঘশ্বাসে চাঁদ দোলে। সেদিনও এমনি চাঁদ ছিল। দীর্ঘশ্বাস ছিল। আজও আছে। সেদিন ছিল শাপলার বিল। বিলের ধানক্ষেত। হিমানী। আজ সমুদ্র। নুনের সাগর। লবণাক্ত অশ্রুর ঢেউ। যেন পৃথিবীর চোখে অনন্ত জল। সেদিনের আর এদিনের এই হলো পার্থক্য। মনে পড়ে– মনে পড়ে পাশাপাশি সূর্যাস্ত দেখার পর নিঃশব্দে উঠেছিল তারা। ধীর পায়ে, কথা না বলে ফিরছিল বাড়ি। পুবাকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ। পশ্চিমে সন্ধ্যাতারা। সন্ধ্যাতারা পেছনে রেখে, সন্ধ্যাকে পেছনে রেখে; আগুনে পোড়া অঙ্গার হওয়া লাল সূর্যকে পেছনে রেখে, তারা পুব দিকে চলল। সামনে গোল উজ্জ্বল চাঁদ। তুহিন বলল– 'ওই চাঁদটা তোমাকে দিলাম। আজকের এই চাঁদ তোমার কপালের টিপ! নিলে তো?' খুব খুশি হিমানী। হাত ধরে 'তুমি দিলে, নেবো না আবার? সে কি হয়? যদি বলো– গোটা সাগরটা দিলাম– চোখে রাখো, তা-ও রাখব।' তুহিন– হিমানী, তুমি পারলে এ কথা ভাবতে, আমি তোমাকে এক সাগর অশ্রু দেব?' 'রাগ করলে দাদা, আমি তো অত ভেবে বলি নি, বলি নে; তুমি কেন রাগ কর? বলছি না রাগ করা চলবে না? আর রাগ করতে পারবে না– কত বলতে হবে আর তোমাকে? আমার বুঝি কষ্ট হয় না তুমি রাগ করলে?' বাঁ হাতে বাঁ হাত ধরে– পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে– মাথার পেছন দিয়ে ডান হাত নিয়ে– থুৎনি ধরে বলে তুহিন– 'আচ্ছা বেশ, আর করব না রাগ, হলো তো?' কিন্তু রাগ যে কখন দুর্বাসার মতো চেপে বসে মগজে তা তো বোঝা যায় না।
ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চাঁদ। আরও। মনে হচ্ছে নীল থালায় একখণ্ড মাখনের সন্দেশ। ধানক্ষেত পেরিয়ে শাপলার বিলে। নৌকায়। দু'জন। হিমানীর হাতে বৈঠা। হাল্কা কুয়াশা আরও মোহনীয় করেছে জ্যোৎস্না। সারা বিলে হেসে আছে অগুণতি শাপলা। সাদা। সাদার মেলা। শাপলার ঘ্রাণ। একটা শাপলা ফুল তুলে তুহিন হিমানীর হাতে দিল তুলে। হিমানী বলল– আজকের এই সুন্দর রাতে এ আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া; সার্থক হলো জাগা এই কোজাগরী পূর্ণিমার রাত।
তুহিন ভাবে– 'এ কোন্ হিমানী? এ কি তার মনের কথা; নাকি মনগড়া কথা? হিমানী কি তাকে বুঝতে পারে না; না কি সে-ই বুঝতে পারে না হিমানীকে?' হঠাৎ কী হলো– চাঁদটা ছুটে পড়ে গেল। আকাশ থেকে। নৌকোয়। নৌকোয় পড়ে গড়াল। কাৎ হয়ে। চারদিকে খাঁ খাঁ অন্ধকার। সামনে বসে হিমানী। জীবন্ত নয়। পাথুরে মূর্তি। পাথুরে হিমানী। সামনে তার শ্রাবন্তীর কারুকার্য। নিজেকেও তার দুর্বোধ্য লাগছে নিজের কাছে। সব মানুষই কি দুর্বোধ্য? নাকি কেউ কেউ দুর্বোধ্য? কোনো মানুষই কি বুঝতে পারে না একে অপরকে? নাকি কেউ কেউ পারে বুঝতে? হিমানীর কণ্ঠস্বর আর শুনছে না তুহিন। দেখছে না শাপলার বন। পাচ্ছে না ধানফুলের গন্ধ। চাঁদ নয়, জল নয়; পাথর পৃথিবীতে শুধু পাথর-প্রতিমা। নির্জীব ছবি। প্রাণ নেই, প্রেম নেই– এ কেমন পৃথিবী! শুধু যান্ত্রিক বাঁচা। তুহিনের চোখের সামনে হঠাৎ সমস্ত শাপলাগুলো, শাপলার ফুলগুলো– সাদা– হঠাৎ পাখা মেলে উড়ে গেল। আকাশে। হাওয়ায় ভেসে ভেসে সমস্ত সাদা উড়ে এসে পড়ল সমুদ্র সৈকতে। তুহিন দেখছে– সামনে সাদা এক ঘোড়া। পুরীর সৈকতে। সম্বিৎ ফিরে পায় হঠাৎ। স্মৃতির ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল এতক্ষণ। নির্জন সমুদ্র সৈকতে নিশুতি রাতে কী এক মোহ থাকে।
নিঃসঙ্গতা কাটাতে এসেছিল সে এখানে। সে পারছে কই? এই সমুদ্রের লোনা জলের দীর্ঘশ্বাস সঙ্গ দেয় তাকে। প্রতিমুহূর্তে সঙ্গ দেয় হিমানী। নিঃসঙ্গতারও কি তাহলে সঙ্গী থাকে? মনে পড়ে– সেদিন জ্যোৎস্নায় কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। স্থির হয়ে পড়ছিল নৌকা। হিমানী। জগৎ। জীবন। সব। এক সময় হিমানী বলল– 'দাদা, কাছে

এসো না!' সে ডাকে চমকে ওঠে তুহিন। সচল হয়। কাছে যায় যন্ত্রচালিতের মতো। থামে। বসে পড়ে। দু'হাতে হিমানী তুলে ধরে মালা। শাপলার। শাপলা ফুলের নয়। শাপলার মালা। এতক্ষণ বসে বসে তৈরি করেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো হঠাৎ সামনের দিকে নুয়ে পড়ে মাথা। তুহিনের। আর মাথা গলে গলায় চলে যায় শাপলার মালা। তুহিনের পা ছুঁয়ে হিমানী প্রণাম জানায়। বলে– পূর্ণিমার প্রণাম। তুহিনের মনে হলো পায়ে তার হিমের ছোঁয়া– দিয়ে গেল উত্তুরে হাওয়া। পূর্ণিমার প্রণাম। সত্যিই তো! হিমানীই তো পূর্ণিমা। তার উপস্থিতিই তো জ্যোৎস্না।

আশ্চর্য! এভাবেই বুঝি সূর্যোদয় ঘটে। এভাবেই বুঝি সূর্যাস্ত ঘটে। এভাবেই বুঝি চাঁদ ওঠে। চাঁদ ডোবে। ভোর হয়। কখন, তা টেরই যায় না পাওয়া। সমুদ্রের অপর পারে আকাশের তলে লালাভা। একটিমাত্র তারা আকাশে। শুকতারা। পুবাকাশে। সেদিনও– যেদিন সারারাত ছিল– নৌকায়– শাপলার বনে– দু'জনে– এমনি ভোরে- শুধু শুকতারা জাগা ভোরে তারা ফিরছিল ঘরে, সারা রাত জ্যোৎস্নায় ভিজে। মনে পড়ে– মনে পড়েই থাকে। সেদিন ছিল ধানফুল– শাপলা ফুলের গন্ধ; আজ ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাস। সেদিন ছিল নৌকা; আজ শুকনো সৈকত। সেদিন ছিল শাপলার পাথার; আজ সমুদ্রের ঢেউ। সেদিন ছিল হিমানী; আজ সে একা। একা। একা কি? আজও তো হিমানী দিচ্ছে সঙ্গ? পাশে নেই; কাছে নেই; মিশে আছে আত্মায়, মনে।
হঠাৎ তার মনে হলো– ওই যে সূর্য উঠল রক্ত রাগে রাঙা– সমুদ্র ফুঁড়ে– আকাশের নীলে– সে-ও তো একা। নিঃসঙ্গ। সে-ও তো তার মতো বেদনায় রাঙা। এই যে বেদনার অশ্রুতে ধোয়া সূর্য– সে তো একান্ত একা এই শূন্যের নীলে; নীলের শূন্যে। জ্বলছে অন্তর্জ্বালায়। তারও তো ভেতরে চলছে নিয়ত ভাঙা-গড়া। প্রত্যেকের হৃদয়ই কি এরকম সূর্যের মতোই জ্বলছে? কেমন এক ঘোর লেগে যায় তার ভাবনায়। বসে পড়ে সৈকতে, বালুতীরে। আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে লাগল সূর্যের। ভাবল– এমন করে তো সূর্য ওঠা দেখা হয়ে ওঠে নি আগে কখনও? দেখছে। দেখছে সূর্য ওঠা। দেখবে সে সূর্য ডোবা। আজকের।
বাসায় ফেরে সে মাথায় করে রোদ। দেখে– দরজায় বসে মুনিয়া। বাজার করবে। মুনিয়া ওড়িয়া। ওর ভাষা বোঝে না তুহিন। মুনিয়াও বোঝে না তুহিনের ভাষা। এটাই যত ঝামেলার। একটা বললে অন্যটা বোঝে, ভিন্নটা করে। সমস্যা। অবশ্য রান্নার ঝামেলার জন্য মাছ-মাংস বাদ। দুধ, ডিম, ঘি, মাখন, সব্জিই যথেষ্ট। দু'টো শব্দই শুধু শিখেছে তুহিন– ধাইকিরিকিরি মানে তাড়াতাড়ি; আর মাইকিরিকিরি মানে ধীরে। তাই তুহিন টাকা দিয়ে ইঙ্গিতে এদিক ওদিক বুঝিয়ে বলল– ধাইকিরিকিরি চ্যলে আও।
দুপুর গড়াল বিকেলে। খাবার পর বিশ্রাম নেয়া তার অভ্যাস। সামান্য ভাতঘুম। দুপুরের। ঘুম আর জাগরণের ক্রান্তিকালে মেঘের গন্ধ এল নাকে। কেমন শব্দ করে মাথার মধ্যে ঢুকে গেল মেঘ। হাল্কা-মিহি-ফুরফুরে মেঘ। সামান্য খুলে গেল চোখ। দেয়ালের ছবিটা কেমন যেন নড়ে উঠল একটু। না নড়ে নি। স্থির। ছবিটা কারওই না। সন্ধ্যার তালবন। সূর্যটা ডুবছে ডুবছে। আকাশ ধূসর। দূরে পাহাড়। কালো। একটা পাখি। উড়ছে। কালো। সবই লাল-কালো মেশানো মায়া। ছবিটি স্থির। অথচ মনে হলো তার যেন নড়ে উঠল একটু। এমন মনে হলো কেন? এমন মনে হয় কেন? ঘোর কাটতে একটু সময় লাগল তার। না। মেঘ নয়। বেবির শব্দ। বেবিট্যাক্সির শব্দ। ছবিটা দেখে মনে হয়েছিল সন্ধে হয়ে গেছে বুঝি। না। হয় নি সন্ধে। পড়ন্ত বিকেল এখন। এখনও আকাশে রোদের লালিমা। বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলে তাকাল। জানালা দিয়ে বাইরে। জুতো পরা একটা পা। ডান পা। বেবি থেকে নামল মাটিতে। জুতোর একটু উপরে ধুতির পাড়। এরপর আর একটা পা। বাম পা। এক জোড়া বুড়ো পা মাটিতে। বেশ মজা লাগছিল তুহিনের দেখতে। ভাবতে। এরপর সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি পরা একটা শরীর। মাথা-ধড় সব। চোখে চশমা। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার এক প্রৌঢ়। নেমেই তাকালেন একবার এদিক ওদিক। চোখের ফ্ল্যাশ মেরে নিলেন। ঘড়িতে সময় দেখলেন। এরপর একটা মমতা মাখানো ডাক– আয় মা, নেমে পড়। এরপর– এরপর কল্পনা।
ট্যাক্সি পশ্চিমের দরজায়। এপাশ থেকে আবডাল। জুতো পরা এক যুবতী পা। বাঁ পা। এরপর ডান পা। এক জোড়া যুবতী পা। উপরে– একটু– শাড়ির পাড়– এ সবই কল্পনা। কল্পনা করতে ভালোই লাগে তুহিনের। তার ধারণা– বাস্তবের মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ নয়। যান্ত্রিক। রোবট। কিছুটা স্বপ্ন, কিছুটা কল্পনার মিশেল যদি বাস্তবের গায়ে রঙের তুলি বুলায়, তবেই মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে। স্বপ্ন, কল্পনা আর বাস্তবের মিশেল হলো মানুষ– জীবন। অতএব, ভাবতে দোষ কী? ভাবনাই তো বেঁচে থাকার ফুয়েল। তাই সে ভাবে। ভাবনার প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসে এক যুবতী শরীর। সুদর্শনা। সেও একবার তাকাল এদিক-ওদিক। 'বা সুন্দর তো!' বলে হাঁটা শুরু করল বুড়োর পেছনে পেছনে। বেবি চালককে ব্যাগগুলো নামাতে বলে চলে এলেন সামনে। আগেই ছাপ-ছুতোর করা হয়েছে পশ্চিমের বাংলো। সেটাতেই গিয়ে উঠলেন। কেমন এক ঘোরে কেটে গেল সময়টুকু। মনে পড়ল– আজ তো সূর্যাস্ত দেখতে যাবার কথা। তাই উঠে পড়ল তড়িঘড়ি। বাথরুম থেকে ফিরে দু'টো কাবাব। জলদি এক কাপ কফি তৈরি করে শেষ চুমুক দিয়ে পা বাড়াল বাইরে। পশ্চিমের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিল। লজ্জায় পারে নি। ভদ্রতা এসে ঢেকে দিল ইচ্ছে। চলে গেল সৈকতে। বিকেল বেলা নির্জনতা খোঁজা বৃথা। তবুও হাঁটল পুবে– আরও পুবে– যেখানে

মানুষের ভিড় একটু হলেও কম। ঝাউ আর সাগরের দীর্ঘশ্বাস শুনতে শুনতে বসল সে। সূর্য ডুববে– একটু পরেই– কেন যেন মনে হলো এ ডোবাই যদি শেষ ডোবা হয় সূর্যের– যদি আর কোনোদিন সূর্যোদয় না হয়– যদি আর না হয় ভোর– না আসে দিনের আলো– তবে? কেন যেন মনে হচ্ছে, এটি অনন্ত সূর্যাস্তের একটি নয় বরং একটি অনন্ত সূর্যাস্ত। শেষ সূর্যাস্ত। শেষ।
ধীরে ক্রমশঃ নরম সূর্যটা এগিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে। ডুবে যাবে। গোটা আকাশ লাল। সাগর লাল। মনে হয় সাগরের জলে– পশ্চিমে– আগুন লেগেছে। সে আগুনের তাপে পুড়ে– গলে গলে ঝরছে সূর্য। সূর্য নয়, জীবন। প্রতিদিন জীবন এভাবে যায় ঝরে। এভাবেই। কেমন একটা বেদনা চিনচিনিয়ে ওঠে বুকের ভেতর। সব যেন কেমন মনে হয়। গুলিয়ে যায়। মনে পড়ে শিবেশের কথা, চিতার আগুনে এভাবেই গলে গলে ঝরছিল শিবেশ। এভাবেই সবাই ঝরে, ঝরবে। তুহিনও। ভাবতে ভাবতে দেখতে পায়– সূর্যটা তুহিন। গলছে– ঝরছে– সাগরের জলে। ঝরতে– ঝরতে– ঝরতে– এক সময় দু'চোখে অন্ধকার নামে তুহিনের। সামনে আর কোনো দৃশ্য নেই। শুধু সাগরের ফোঁসানি। ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাস। রাতের অন্ধকার। তুহিনের নিজেকে মৃত মনে হয়। সব আলো ঝরে গেলেই তো মৃত্যু আসে। অন্ধকারে বসে অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে থাকে তুহিন। কী যে ভালো লাগে– লাগছে– অন্ধকার। এখানে সবই মনে হয় সমান। লাল-সাদা-কালো-সবুজ-নীল-বেগুনি-খয়েরি-কমলা সবই এক। রঙের খেলা শেষ এখানে। রঙের মেলা শেষ। পাথর অন্ধকারের মধ্যে বসে আছে পাথর তুহিন। সামনে অন্ধকার পাথার। নীল নয়, অগাধ কালো জল। অসীম কালো জল। কালো। কালো। অন্ধকার।
এক ভাব কাজ করছে মাথার মধ্যে। প্রশ্ন জাগছে– জলমগ্ন এ পৃথিবীর অনন্ত শয়নে কে শোয়া? মনে হলো– এটি একটি কবিতার লাইন হতে পারে। ডায়েরি ও কলম সাথেই থাকে। কিন্তু অন্ধকার। কী করা? লিখে না রাখতে পারলে লাইনটা আবার অন্ধকারেই হারিয়ে যাবে। ও অন্ধকারের বুক থেকেই জেগে উঠে অন্ধকারেই যায় হারিয়ে। মনের ভাবনা তো? তাই অন্ধকারেই ধরে রাখার চেষ্টা চালায়। কাগজ হাতড়ে অন্ধকারেই লিখতে থাকে–

জলমগ্ন এ পৃথিবীর অনন্ত শয়নে
কে শোয়া,
কে এমন অচেতন অনন্ত ঘুমে,
বিষ্ণু?
পদ্ম ফুটেছে কি নাভিমূলে তার?
এ কী উত্তাল উল্লসিত সলিলে
কোন্ ঘুমে নিমগ্ন সে অহর্নিশি?
তবে কি জগৎ সৃষ্টির কোনো মন্থর লীলা?
নাকি নৈসর্গিক বৈরাগ্য?
কে দেবে উত্তর এ প্রমিত প্রশ্নের?
কোথাও বিশ্বব্যাপী বাজে নির্জনতার সুর–
ও তো কবি
অনন্ত জলে ভাসে কবির লাশ
নাভিতে পদ্ম নয় কবিতা সম্ভার
ও তো শিল্প সৃষ্টির সযত্ন প্রয়াস–

উঠতে ইচ্ছে করছে। না, ইচ্ছে করছে না। ঠিক তাও নয়। কী যে ইচ্ছে করছে, বুঝতে পারছে না। ওঠা প্রয়োজন। কিন্তু পারছে না। এমন কেন হয়– ইচ্ছে করছে ভাবতে। অথচ পারছে না। ইচ্ছে করছে ভালোবাসতে। অথচ পারছে না। পারছে না বলতে। পারছে না প্রকাশ করতে। এ কেমন দ্বন্দ্ব-দোলার জীবন? এ কেমন সংশয়? কেন এ সংশয়? ঝট্ করে পড়ে উঠে। ঘড়ি নেই হাতে। জানে না সময় কত? বেশি না, বড় জোর দশটা এগারোটা রাত। সময় দিয়ে জীবনটাকে শৃঙ্খলিত করা পছন্দ নয় তুহিনের। তাই ঘড়ি নেই তার হাতে। সময়ের সন্তান সে। সময়ের স্রোতে চলাতেই তার আনন্দ। পা বাড়ায় বাসার দিকে।
কাছাকাছি আসতেই বাতাসে হারমোনিয়ামের শব্দ– সাথে কোনো সুরেলা কণ্ঠ। নারী কণ্ঠ– মিষ্টি। শেষ লাইনটা শুধু শোনা গেলো গানের– আকাশকে তাই এত ভালোবাসি। তারপর থেমে গেল গান। বাজনা। নিজের উপর রাগ হলো– আর একটু আগে এলে কী এমন ক্ষতি হতো? ক্যাসেটে শোনা আর সরাসরি কণ্ঠে শোনা এক ভিন্ন জিনিস। ঘরে এসে বসল দরজা খুলে। কান সজাগ রাখল আবার যদি একবার গান ওঠে অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে। বুঝতে বাকি নেই– সেই দিনের কল্পনায় দেখা পা যার, এই কণ্ঠও তারই। চমৎকার কণ্ঠ। আবার হারমোনিয়ামের শব্দ। তাহলে আবার হতে পারে গান। হ্যাঁ তাই। ইচ্ছে অদম্য হলে মনে হয় সাফল্য এসে ধরা দেয় হাতে। বায়বীয় মাখনের

মতো এক পশলা সুর এসে জড়িয়ে ধরল তুহিনকে। ইচ্ছে করল– কাছে গিয়ে– পাশে গিয়ে শুনতে। পারল না। ইচ্ছে তো ডানা-ভাঙা পায়রা। প্রাণভরে শুনছে– নতুন কোনো গান– শোনে নি আগে কখনও–

ফেরারি পাখিরা বুঝি ফেরে না ঘরে
পথের নেশায় মন কেমন করে ॥
সীমানা খুঁজেই তার দিন চলে যায়
ঠিকানা মেলে না তবু ক্লান্ত পাখায়,
চোখের সাগরে তার আঁধার ঝরে ॥
মেঘে যে আগুন আছে দেখবে বলে
ডানা মেলে যায় চলে আকাশ তলে,
মেঘের আগুনে পুড়ে ঝলছে মরে ॥
ডানা-ভাঙা পায়রারা ইচ্ছে আমার
পাখা মেলে চায় যেতে আকাশে আবার,
আশাহত ব্যথা নিয়ে মাটিতে পড়ে ॥

এ কী? এ কেমন গান? তুহিনের মনের কথা এলো কোত্থেকে এ গানে? এ যেন তুহিনের নিজের কথা; হৃদয়ের কথা। কে ভাই ফেরারি পাখি? তুহিন? শুধু কি তুহিনকে শোনানোর জন্য এ গান? সাগর পারের গান? গান থামলে উঠে পড়ে তুহিন চট্ করে। চলে আসে বাইরে। চলে আসে পশ্চিমের দরজায়। হাত চলে যায় কলিং বেলের কাছে। হঠাৎ খেয়াল হলো– এ কী করছে সে? কেন এসছে এখানে? ভাবল– তাই তো, কেন আসা? ফিরল আবার। কিন্তু, থেকে গেল এক অতৃপ্তি– কার গান এ; কী করে সে টের পেল তুহিনের মনের কথা? যার গান শুনল, তাকেই তো হয় নি দেখা? বেবি থেকে নামার সময় এক পলক একটু দেখল– শীঘ্র চোখ নামিয়ে নিয়েছিল তুহিন চোখাচোখি হয়ে যাবার লজ্জায়। তাই দেখা হয় নি ভালো করে। অথচ শোনা হলো হৃদয় দিয়ে। অন্ততঃ একটা ধন্যবাদ জানানোও তো উচিত? কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না সে– পরিচয় নেই অথচ... সেটা কি ভদ্রতা হবে? এখানেও সংশয়। প্রাণের কথাটাও জানাতে পারবে না? ভাবছে... অনুভব করছে... অথচ পারছে না বলতে...। মাঝে মাঝে ঘেন্না হয় এই এত এত কায়দা কানুনের পৃথিবীকে। পৃথিবী এতটা Formal কেন? কেন Formal এই পৃথিবীর মানুষ? বড় কষ্ট হয় তুহিনের।
আর হলো না গান। থেমে গেল সুর। তবু একটা আশার সলতে জ্বেলে মনে, কাৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকল তুহিন। ঘরে মৃদু সবুজ আলো। স্বপ্নীল। এ আলোটাকেই তুহিন রাত্রি রঙ বলে। খাওয়া হয় নি তার। খেলে মনে হয় সুরের রেশটাই যাবে নষ্ট হয়ে। রজনীগন্ধায় বেশ মায়াবী গন্ধ দিচ্ছে। এর নাম রেখেছে সে নিশিগন্ধা। নিশিগন্ধাই তার একমাত্র সাথি এখন। জাগরণের।
আশ্চর্য হয় তুহিন। সে খেতে বসছে। টেবিলটা গোল। নীল। ঢেউ খেলানো। মনে হয় সাগর। সাদা ধবধবে একটা প্লেটে খাবার। খাবারের রঙ সবুজ, হাল্কা রজনীগন্ধার সুবাস তাতে। খাবারটা মনে হয় কালকের শোনা সেই সুর। সবুজ সুর। সাদা থালাটা মনে হয় চাঁদ। আর খাবার দিচ্ছে হিমানী। হিমানীর মুখটা কালকের দেখা ওই মেয়েটার মতো। আশ্চর্য সাদা শাড়ি পরেছে হিমানী। সাদা ব্লাউজ। সাদা টিপ। সাদা চুড়ি। সাদা দুল। সাদা একটা মালা। হিমানীর চুলও সাদা। হিমানী যেন বরফ। চামচ দিয়ে সুর তুলে খাচ্ছে তুহিন। কোনো স্বাদ পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, সুর নয় জ্যোৎস্না খাচ্ছে; জ্যোৎস্নার শরীর। সবুজ জ্যোৎস্না, সাদা থালায়। হিমানী যেন বসে থাকতে থাকতে রজনীগন্ধা হয়ে গেল। ফুলদানিতে ফুটে থাকা নিশিগন্ধা এখন হিমানী। গা থেকে তার চমৎকার গন্ধ আসছে ভেসে। হঠাৎ টেবিলের ঢেউগুলো প্রবল হলো। ভাসিয়ে নিল সব। খাবার– সুর– নিশিগন্ধা। হিমানী যেন বলছে– ধরো আমাকে, আমি ভেসে যাচ্ছি। তুহিন শীঘ্র ঝাঁপ দিতে যাবে, এ সময় হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে সেই মেয়ে, তীর থেকে ফেরার পর যে গান গেয়েছিল কাল রাতে। হাসির শব্দে ফিরে তাকায় পেছনে তুহিন। চোখ মেলে। চোখে এসে পড়েছে আলতো এক পশলা নরম রোদ, ভোরের। ভাবছে– কী হলো তাহলে? হঠাৎ আবার সেই হাসি এবং কথা– যেও না, যেও না একা; আমিও যাব, দাঁড়াও না। ঘুম ভেঙে গেল। জানালায় তাকিয়ে দেখল বুড়ো চলছেন সমুদ্রস্নানে। পেছনে মেয়েটি। অপূর্ব এ দৃশ্য। ধপধপে এক বৃদ্ধ। স্নানের পোশাক। পেছনে নিটোল ভোরের মতো অনিন্দ্যকান্তি এক তরুণী; বৃদ্ধের মেয়ে। রজনীগন্ধা ডাঁটার মতো লিকলিকে, শুভ্র। অদূরে ঝাউবনের কুয়াশা, সফেদ সমুদ্রের তরঙ্গ। সব মিলিয়ে স্বর্গীয় সকাল। সার্থক হলো তার আজকের সকাল। মনটা পবিত্র হয়ে গেল। কী যে এক ভালো লাগা তাকে জড়িয়ে রেখেছে আজকের সকালে! মাঝে মাঝে বাঁচতে ইচ্ছে হয় এই সব স্বর্গীয় পরশে। সমুদ্র ডাকছে তাকে।

আর শুয়ে থাকা বৃথা মনে হয়। জীবনের অর্ধেকটা সময় পার করে দিয়েছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েছে, শুয়ে ঘুমিয়েছে, বসে ঘুমিয়েছে, দাঁড়িয়ে ঘুমিয়েছে, জেগে ঘুমিয়েছে। ঘুম কেড়ে নিয়েছে তার হীরের মতো মূল্যবান সময়। ঘুম মানেই তো মৃত্যু। ছোট ছোট মৃত্যু। সেই মৃত্যুর কাছেই নিয়ত আত্মসমর্পণ। প্রতিদিন। ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া মৃত্যুর দিকেই। আর নয় । আলস্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। সেও সমুদ্রস্নানে যাবে। প্রভাত সূর্য গায়ে মেখে সেও দুলবে ঢেউয়ের দোলায়। সৈকতের বালু জড়াবে গায়। মিশে যাবে আকাশ–সমুদ্রের বিশাল উদারতায়।

সৈকতে পৌঁছে সে অনুভব করে, একা একা আনন্দ হয় না। একা একা সুখ উপলব্ধি করা যায় না। একা আর বোকা সমান কথা। সবাই দু'জন কিংবা বেশি। মনে হলো 'একা সে সুন্দর হয়, হইলে দু'জন'। কাউকে চেনে না সে। এ তার অচেনা সৈকত। অচেনা শহর। অচেনা মানুষ। কারও সাথেই সে শেয়ার করতে পারছে না তার সুখ-দুঃখের কথা। সে শুধু দেখে যায়। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে মানুষ। তরঙ্গের চূড়ায় উঠে আবার নেমে যাচ্ছে নিচে। ডুবে যাচ্ছে ঢেউয়ের আড়ালে। দৃশ্য-অদৃশ্যের খেলায় মেতেছে শিশু শিশু মানুষেরা। সমুদ্র কেমন নাচায় মানুষকে নাগরদোলার মতো। তুহিন বিস্ময়-বিহ্বল। এই বিশাল উদারতার সামনে দাঁড়িয়ে সমুদ্রকে প্রণাম জানায়।

ভয়ে ভয়ে নেমে যায় নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গমালায়। পা নয়, আগে হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে সমুদ্রকে, নেমে যায় ধীরে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বিপুল জলরাশিতে। সেও দুলবে ঢেউয়ের দোলায়। জীবন দোলায়। সমুদ্র, পরম বন্ধু, বক্ষে টেনে নেয় দুর্বোধ্য আকর্ষণে। নিজকে সঁপে দেয় তুহিন এই উদারতার কাছে, বিশালতার কাছে।

চার

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

কী আশ্চর্য এই জীবন, তাই না মা? শুধু চলা, চলা। ঘুমুনোর আগ পর্যন্ত যেতে হবে মাইলের পর মাইল– কী অদ্ভুত সব?! মেয়ে রাকাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজির অধ্যাপক মিহির ভূষণ সাগ্নিক এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। রাকা তরকারি কুটছিল পাশেই। উনুনে ফুটছে চাল। প্রতি বছরই সুযোগ পেলে একবার আসেন এখানে– পুরীতে। বেড়াতে। সমুদ্র-সৈকতে। এ সময়ে। এবারও এলেন। আবার শুরু করলেন–
'আমার-ই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে-পশ্চিমে
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'!
সুন্দর হলো সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্ব কথা, এ কবির বাণী নয়
আমি বলব, এ সত্য
তাই এ কাব্য।'

রাকা– বাবা কবিতাটা বড় অদ্ভুত শোনায় তোমার মুখে। বড় সুন্দর কবিতা। আর তুমিও সব সময় আওড়াতেই থাক এ কবিতাটা। শুনতে শুনতে আমরাও মুখস্থ হয়ে গেছে । কী এক আবেশ ছড়িয়ে যায় প্রাণে মনে।
মিহিরবাবু– এ জন্যেই তো রবি ঠাকুর। শ্যামলী কাব্যের এ কবিতাটাই আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। কেন জানিস্? কবিতার নামটাই 'আমি'। অর্থাৎ আমার চেতনা দিয়ে আমি পৃথিবীকে যেমন দেখব, পৃথিবী আমার কাছে সে রকমই। প্রকৃতপক্ষে তো পৃথিবী যে রকম, সে রকমই। আমরা শুধু চেতনার রসে ভিজিয়ে দেখি ভালো বা মন্দ; সুন্দর বা কুৎসিত। আমরা যেভাবে দেখি, সেভাবেই সে ধরা দেয় আমাদের চোখে, মনে।
রাকা– বাবা, এ তো করলে কবিতার বিশ্লেষণ? তোমার ভালো লাগার কারণটা কিন্তু বলো নি?
মিহিরবাবু– ও, হ্যাঁ, তাই তো? এটাই তো একটা কারণ। তাছাড়া অন্য একটা কারণও আছে। তোর মা। তারও এ কবিতাটা খুব ভালো লাগত। সাধারণের দৃষ্টিতে তোর মা খুব সুন্দরী ছিল না। অথচ আমার কাছে মনে হতো অত সুন্দর পৃথিবীর আর কেউ নয়। প্রচণ্ড ভালোবাসতাম তোর মাকে। তার নামও যে শ্যামলী। আমি অবশ্য আদর করে ডাকতাম 'শ্যামা'।
রাকা– বাবা, আবার কিন্তু, মায়ের কথাই বলছ শুধু। বলেছি না, অত ভাববে না? মায়ের কথা মনে করে মন খারাপ করা যাবে না।
মিহিরবাবু– হ্যাঁ তাই তো? ঠিক আছে, ভাবব না। কিন্তু, ভাবতে না চাইলেও যে ভাবনা যায় এসে মা? কী করি বল? আমি কি ভাবি? আমাকে কেউ ভাবায়। এত সহজে কি স্মৃতি চলে যায়? আমি ছেড়ে দিয়েছি ভাবনাকে। কিন্তু ভাবনা যে আমাকে ছাড়ে না। ভাবনা ভাসায় আমাকে স্রোতে তার।
একটু থামেন মিহিরবাবু। তরকারি কাটে রাকা। কী যেন ভাবেন। মিহিরবাবু আবার– I had a lovers quarrel with your mother. জানিস মা, জীবনটা যেন কেমন। প্রহেলিকাময়। মন আর জীবনের কোনো নির্দিষ্ট আর স্পষ্ট পরিধি নেই–
Life is too much like a pathless wood
Where your face burns and tickles
With the cobwebs
Broken across it and one eye is
weeping
From a twig's, having lashed
across it opend

জানিস, কবিতা হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণার ওষুধ। ব্যথা ভুলিয়ে দেয়। নাকি জাগায়? হতেও পারে। তবে বলা যায় ব্যথা জাগিয়ে ব্যথাকে তুচ্ছ করে দেয়।
রাকা– বাবা, আজ কিন্তু নবমী! আজকের পরিকল্পনাটা কী?
মিহিরবাবু– ও হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করেছিস। এক কাজ করা যেতে পারে– আজ বহু দূরে যাব হাওয়া খেতে। সমুদ্রের হাওয়া মনকে উদাস করে দেয়। দেখ কী আশ্চর্য উদারতা– আকাশ, বাতাস আর সাগরের উদারতা– মিশেছে এসে তিন অসীম। হ্যাঁ, পরিকল্পনা– বিকেলে মানে রাতে– রাতে ফিরে খিচুড়ি রান্না করবি। ফ্রিজে ইলিশ মাছ আর মুরগির মাংস আছে। মাছ ভাজি আর মাংস রোস্ট। চমৎকার হবে। তার আগে হবে তোর গান।
রাকা– কোন্ গানটা দিয়ে শুরু?
মিহিরবাবু– তোর লেখা সেই গানটা– ওই যে– ভুলে যায় যদি কেউ, ভুলে যাবে।
রাকা– আচ্ছা।

পিতা ও পুত্রী বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ। পুবে– নির্জন সমুদ্র-সৈকতে। সিঁদুরে আকাশে কুসুম বেলা। ঝাউবন শাঁ শাঁ। উথাল-পাথাল ঢেউ। দূরে মাছ ধরে নুলিয়ারা ঢেউয়ে ভেসে ভেসে। কে একজন বসে– যেখানে ঢেউ এসে মিলিয়ে যায়– এক মনে দেখছে দূরের ঢেউ; নাকি ঢেউয়ে ভাসা নৌকা। নাকি অন্য কিছু যা ওখানে নেই। উদাস চোখে। সামনে তাকিয়ে। নির্জনে নিঃসঙ্গ একজন। এমন লোক পেলে ভাব করতে ইচ্ছে হয় মিহিরবাবুর। ইচ্ছে হয় প্রাণ খুলে দু'টো মনের কথা বলে। কাছে এগুলো। দাঁড়াল পেছনেই। পাশেই দেখল পড়ে রয়েছে হিমানীর লাশ। ঢেউ এসে যেখানে মিলিয়ে যায়, সেখানে লেখা, বালুতে– হিমানীর লাশ। মিহির বাবুর অবাক হবার পালা। রাকা তার বাবার ভাব বুঝতে পেরে মুচকি হেসে সরে গেল অন্য দিকে। ঝিনুক খোঁজা। মিহিরবাবু ভাবছেন– কে এই পথিক? কে ওই হিমানী? কেন এই লেখা? ভাবছেন। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল– The fact is the sweetest dream, The Fact is the sweetest dream. সংবিৎ ফিরে পেল নিঃসঙ্গ তুহিন। চমকে পেছনে তাকাল। লোকটাকে চেনা মনে হলো। কবে, কখন, কোথায় দেখেছে– মনে পড়ছে না। মনে হলো– কয়েক লক্ষ বছর আগে দেখেছে। এই সাগর তীরেই। উঠে দাঁড়াল– হাত জোড় করে বুকে ঠেকিয়ে নমস্কার জানাল এই ধবধবে প্রৌঢ়কে। প্রৌঢ় লক্ষ্যই করে নি। ভাবছে– হিমানী, বরফ তুষার, হিম, মৃত্যু– সবই তো হিমানীর লাশ। দ্বিতীয়বার তুহিন– নমস্কার।
সংবিৎ ফিরে পেয়ে প্রতি নমস্কার জানালেন তুহিনকে। নিকটবর্তী দূর থেকে মৃদু হাসছিল রাকা। এবারে কাছে এল। নমস্কার জানাল তুহিনকে। হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল তুহিনের– এরা তো কালকের দেখা সেই পিতা-পুত্রী। সূর্যটা এবার লাল জল স্পর্শ করল কেবল।
ধীরে সমস্ত লালকে শুষে নিল কালো। তখনও কোনো তারা ফোটে নি নীলে। নীলও মিশে যায় কালোয়– আর তখনই তিনজন পা বাড়ায় বাংলোর দিকে। কথা হয়– জানা হয়– একই বাংলো– গন্তব্য এক। হঠাৎ বলে বসেন মিহিরবাবু–
– আচ্ছা তুহিনবাবু, আজ না হয় আপনি অতিথি হোন আমাদের; মা আমার খাওয়াবে। গানও শোনাবে। বেশ আড্ডা হবে।
এ যেন মেঘ না চাইতেই পানি। ইচ্ছের এত কাছে ইচ্ছেপূরণ থাকে? মনে মনে সে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছে গোপন করে মুখে ভদ্রতা ফোটায়।
রাকা– ইস্ বাবা, তুমি যে কী...? আমি কী গান ...?
তুহিন– না, না, শুধু শুধু আমার জন্য ... গানটা অবশ্য ... থাক না ... কষ্ট করে ...
রাকা– ঠিক তা নয়, আমি বলছিলাম আপনি আসবেন, অবশ্যই আসবেন; কিন্তু ওই গানের... আপনাকে শোনানোর মতো ...
তুহিন– আমি আতিথেয়তা গ্রহণ করলে, ওই গানটাকেই প্রাধান্য দেব।
মিহিরবাবু– বেশ তো, আসুন না, গান শেষে, খাওয়াটাও আজকের এখানে করবেন– আজ নবমী, তাছাড়া, আপনি একা ... আসুন চলে।
বাসায় ফিরেই দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিল এক গোছা রজনীগন্ধা আনতে। বাজরে। পোশাক পাল্টে হাত-মুখ ধুয়ে পরল সাদা পাজামা আর আদ্দির সাদা পাঞ্জাবি। কফির কাপটা নামিয়ে রেখে রজনীগন্ধা হাতে পশ্চিমের বারান্দায় চলল তুহিন। তখনও শেষ হয় নি রাকার রান্না। তাই তো গল্প শুরু হলো মিহিরবাবুর সাথে। এক সময় কবিতা লিখতেন তিনিও; ইংরেজিতে। নিজের লেখা একটা কবিতা আবৃত্তি করলেন–

O silence, dear silence !
I love thee
So that I wish to be deaf
I fear light
So that I wish to be blind
Give the ownership to live in sense dear silence-
If my heart does burn as flame
burn unquenchable
nothing will tell

I'll be dumb like touch-stone
Dear sweetest scent
come as peace and softly touch
the lichen heart
I'll be the coral-rock
in the deep most sea.
This is my self-dedication
to natural silence
give the ownership to live
only in sense
in the natural intimacy
dear silence!!

কবিতা শুনতে শুনতে আবেশী কল্পনায় ভেসে যায় তুহিন। হয়ে যায় নিঃসঙ্গ চিল। রাতের অন্ধকারে ওড়ে আকাশের নীলে। ক্ষীণ হয়ে আসে মিহিরবাবুর কণ্ঠ। অর্থহীন কিছু শব্দ কানে আসে, কিন্তু মনে ঢোকে না। সে দেখে– মেঘশিমুল গ্রাম– হিমানীর চিঠি–
দাদা,
প্রণাম।
১৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার। সন্ধে নাগাদ তোমার দেখা চাই। এই মেঘশিমুল গ্রামে। নয়ত মেঘশিমুলে নামবে মেঘ।
– তোমার হিমানী।
ছোট্ট এই চিঠি। হিমানীর। রুমে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিল তুহিন। দুপুর ১টায় ডাক পিওন শামসু ভাই এসে দিয়ে গেল চিঠি। এই চিঠি। গলায় আটকে গেল খাবার। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাল এ চিঠি। তুহিনের মনে। মারাত্মক। সেদিনই ছিল ১৫ তারিখ। চিঠিটা পেয়ে প্রচণ্ড খুশি লাগছিল। সাথে সাথেই ছিঁড়ে ফেলল খামটা বাঁ হাত দিয়ে। পড়েই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতর। কী ভীষণ, কী মারাত্মক! কিছুই বলে নি। অথচ কত কঠিন কিছু বলেছে। কী করা? সময়ও নেই আর। তাই অসম্পূর্ণ রেখে খাওয়া, তড়িঘড়ি গুছিয়ে সব; ল্যাগেজটা কাঁধে ফেলে ছুটল। একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা গাবতলি বাসস্ট্যান্ড। প্রচণ্ড রাগ হলো ডাক বিভাগের উপর– এতটুকু পথ আসতে এতদিন? আর একদিন দেরি হলেই ...।
রাকা উনুনে। মাংস রান্না শেষ। শেষ মাছ ভাজি। পাতিলে খিঁচুড়ি চড়ছে। সেদিকে ব্যস্ত সে। সারা ঘর ঘি এর গন্ধে ম' ম'। এদিকে এক মনে আনমনে বকে যান মিহিরবাবু। বিশ্লেষণ করেন তার কবিতার। নতুন নতুন কবিতা পড়েন। আলোচনা করেন। দেয়ালে এক গম ক্ষেত। সবুজ। কচি। দোলায়িত নয়। স্থির। বিরাট স্বপ্নীল সমতল। তার ওপাশে লাল এক সূর্য। কুসুম। অস্তাচলে। ডুববে। সেদিকে তাকিয়ে তুহিন। ওই গম ক্ষেতের পাশ দিয়ে ছোট্ট সরু একটা পথ। সূর্যাস্তের প্রাক্কালে সেই পথ বেয়ে তুহিন চলছিল মেঘশিমুল গ্রামের দিকে। সাথে ছোট্ট এক চিঠি। হিমানীর চিঠি।
অস্ত যাবার আগেই কুয়াশার মধ্যে ডুবে গেল সূর্য। আকাশ থেকে শুরু করল নামতে অন্ধকারের কণা। গাঢ় কুয়াশার ধোঁয়া। ক্রমশঃ অন্ধকার এল ঘনিয়ে। সবুজ গমক্ষেত অন্ধকারে ছায়। তুহিন পৌঁছায় হিমানীর বাড়ি। সানাইয়ে পূরবীর সুর। করুণ। কান্না-ভেজা সুর। মিহি দুঃখ-মেশা। পা থেমে যেতে চায় তুহিনের। এ বিয়ের সানাই। হিমানীর বিয়ে?!? আজ তার আনন্দিত হবার কথা। অথচ আনন্দ নেই। বুকের কাছে ঠাণ্ডা এক মুঠো বাষ্প জমে রয়। খবরটা লুকাল কেন হিমানী? লুকোচুরি? বুকের মধ্যে ঝুলে থাকল ঠাণ্ডা একখণ্ড কষ্ট।

বিয়ে বাড়ি। আলোকের ঝর্ণাধারা। উঠোনে আলপনা। সাজানো। কলাগাছ পোঁতা। লোকজনের ব্যস্ততা। তেমন কোনো উপহার আনে নি তুহিন। সময়ও ছিল না। আর জানেও না। হাতে শুধু একটা মিষ্টির প্যাকেট। পথ থেকে কেনা। ব্যাগে ছিল 'শেষের কবিতা' আর একটা 'ফুলদানি'। আর আগেরই কেনা ছিল বালুচরি একটা শাড়ি। কাউকে চেনা লাগছে না তার। কে একজন চিনতে পেরে ঘরে নিয়ে বসাল। ব্যস। ওটুকুই। লোকজনের আনাগোনা। অথচ কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করছে না তাকে ডেকে। দীর্ঘ নীরবতা। বাইরে আসার সময় পাশের ঘরে একটু উঁকি মারল। মেয়েদের আড্ডা। তার ভেতর বসে বধূবেশী হিমানী। অনেক মেয়েরা মিলে সাজাচ্ছে তাকে। হাসির অট্টরোল। অথচ সব দুঃসহ লাগছে তার। যন্ত্রণাদায়ক। বাইরে এল। কাকাবাবুর সাথে দেখা। –এসেছো বাবা? খুব ভালো লাগছে। বসো। প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ায় তুহিন। অস্থির লাগে।

গভীর মনোযোগের সাথে আবৃত্তি শেষ করে তুহিনের চোখে চোখ রাখেন মিহিরবাবু। আশ্চর্য! তুহিন বিহ্বল। অমন করে তাকিয়ে কেন? তবে কি কিছু ভাবছে সে? তুহিনের দৃষ্টিকে ব্যবচ্ছেদ করেন মিহিরবাবু। মিহিরবাবু ভাবেন– এমন কেন হলো? তিনিও আবৃত্তি থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকলেন তুহিনের চোখে। তুহিনের চোখ আটকে আছে সবুজ গমক্ষেতের পরপারে সূর্যাস্তের মায়ায়। দৃষ্টি বেয়ে তুহিনের মিহিরবাবুও চলে যান সূর্যাস্তের কাছে। মনে পড়ে এমনি বহু সূর্যাস্ত ঘটেছে তার জীবনে– সুখের কিংবা কলহের। তবুও কী একটা আবেশ ছিল সেই সব দিনগুলোতে– সেইসব সূর্যাস্তে। হঠাৎ কেন আবার ফিরে ফিরে স্মৃতির কাছে যাওয়া?

সব যেন কেমন হয়ে গেল। কী এক হাহাকার জেগে উঠল আবার মনের প্রান্তরে। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলেন কবিতার কথা। বর্তমানের কথা। মানুষ এমনি করেই বুঝি কখনও সখনও চলে যায় স্মৃতির প্রান্তরে। বর্তমানের এই আমি তখন চলে যায় সেই অতীতের প্রান্তে। খুঁজে ফেরে হারানো দিনগুলো। বর্তমান হয়ে ওঠে অর্থহীন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সেই অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা থেকে।

দেয়ালে টাঙানো গমক্ষেতটা মনে হয় একটু দুলে উঠল তুহিনের চোখে। বিষণ্ন হলো সূর্য। বাইরে এত লোক, অথচ ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে। হিমানীর বিয়ে। তাকে একটু জানালও না আগে থেকে? অথচ আবার আসতে বলেছে। কেমন প্রহেলিকা। কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছে না তুহিন– এমন কেন লাগছে তার? হিমানীর সাথে তো তার এমন কোনো প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি যে সে কষ্ট পাবে? তাছাড়া হিমানী তো তাকে দাদাই ডাকে? তবে কেন এ কষ্ট? সানাইয়ের প্রতিটি তান তার ভেতরটাকে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। এমন কষ্টও থাকে পৃথিবীতে? এ কি তার একারই? নাকি সব হৃদয়েই এমন কোনো কোনো সময় আসে যখন সে ছটফট করে যন্ত্রণায়? এক অজানা অভিমান কাজ করে ভেতরে ভেতরে। চলে আসে বাড়ির প্রান্তে পুকুর পাড়ে। পুকুরের একটা পাড় বাড়ির সাথে মেশানো। সেখানে হাসনাহেনার ঝাড়। অন্যান্য ঝাড়ে থোকায় থোকায় জোনাকি জ্বলছে। আকাশে চাঁদ ছিল। ছিল খাঁ খাঁ জ্যোৎস্না। হাসনাহেনার গন্ধ ছুটছে তীব্র। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল– হাসনাহেনার গোড়ায় কী একটা দুলছে। গাছের গোড়ার একটা ডাল জড়িয়ে। স্পষ্ট বুঝল। সাপ। প্রথমটা আঁৎকে উঠল। সামলে নিল। হঠাৎ মনে হলো ওই সাপটা তার মনটা নয়ত? নইলে এমন সুগন্ধি জড়িয়ে থাকবে কেন এমন ছোবল? বিষাক্ত বিশ্বাস। অসহ্য এক যন্ত্রণা তার শ্বাস রোধ করছে। নিজকে ঘৃণিত মনে হচ্ছে। এই নাকি তার চরিত্র? ভেতরে ভেতরে এই নাকি তার ভাবনা? তবুও আর এক মুহূর্তও সে থাকতে পারছে না এখানে। চট্ করে হাঁটা শুরু করে। এক্ষুণি চলে যাবে এ সানাইয়ের করুণ বাড়ি ছেড়ে। নেমে আসে বাড়ি থেকে। সবার অজ্ঞাতেই হেঁটে চলে আবার সে আঁধার জ্যোৎস্নার গমক্ষেতের আল বেয়ে। খাঁ খাঁ জ্যোৎস্নায় গমক্ষেতটা সবুজ নয়; কেমন এক রঙের যেন দেখাচ্ছে। ধূসর। ম্লান। পীতবর্ণ। মনে হয় তার বুকের প্রান্তর ওটা। তুহিন হাঁটে। ঘাসে ঘাসে শিশির ছুঁয়েছে তার পা। পিচ্ছিল হয়েছে পথ। যেন আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় তাকে। পথ টেনে নেয় তাকে পথেই।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন মিহিরবাবু। তুহিনের পেছনে হাঁটেন। ডেকে ওঠেন– তুহিন, কী ব্যাপার, কোথায় চললেন, আপনি? এ কী? এতক্ষণ আনমনে রাঁধছিল রাকা। কণ্ঠস্বর শুনতে না পেয়ে একসময় পেছন ফিরে তাকায়। দেখে আপনমনে দু'জনে দেখছে গমক্ষেত। নাকি গমক্ষেতের সূর্যাস্ত। ভাবছে– ওটিই বোধ হয় বর্তমানের আলোচনার বিষয়। তাই আবার মন দিল রান্নায়। এবার ফিরে তাকাল বাবার কথায়।

সংবিৎ ফিরে পায় তুহিন। এ কোথায় সে? মেঘশিমুলে? বুঝে উঠতে একটু কষ্ট হয়। সামনে সমুদ্র কেন তবে? থাকার কথা ছিল গমক্ষেত। হঠাৎ তার মনে পড়ল– এ তো পুরী। সে এখন পুরীর সমুদ্র সৈকতে। পেছনে মিহিরবাবু। এতক্ষণে উঠে এসেছে রাকা। কাছে। বলছে– কী ব্যাপার বলুন তো? চলে যাচ্ছিলেন যে? কিছু হয়েছে? বাবা কি কিছু ...?

মহা মুস্কিলে পড়ে যায় তুহিন। কী উত্তর দেবে এ প্রশ্নের? কী করে বুঝাবে সে– কেন সে চলে যাচ্ছিল? জগতে এমন কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে যার উত্তরই জানা যায় না। যায় না বোঝা। নাকি বোঝা গেলেও বলা যায় না! নাকি বোঝাই যায় না স্পষ্ট করে? বর্তমানে ফিরে আসে তুহিন। বলে– তাই তো। আবার ফিরে এসে সোফায় বসে। মিহিরবাবুও ফিরে আসেন। উনুনে ফিরে যায় রাকা। উনুন থেকে নামায় পাতিল। শেষ হয় রান্নাপর্ব। ফিরে আসে রাকা। বিষণ্ন মুখে চেষ্টা করে হাসি ফোটানোর। বুঝতে পারে না, তুহিন কেন চলে যাচ্ছিলেন? সোফায় বসতে বসতে বলে ওঠে তুহিন–

I can'nt die
But live, Million of years
for you, only for you.

বিস্মিত তাকিয়ে থাকেন মিহিরবাবু। পরিস্থিতি হাল্কা করার জন্য রাকা– তোমাদের কবিদের কারবারই আলাদা! কী সব দুর্বোধ্য কাজ। একজন দর্শনের, অন্যজন ইংরেজি সাহিত্যের। মিলেছে বেশ দু'জনে।
হেসে ওঠে সবাই একযোগে। ফিরে আসে আবার সবাই বাস্তবে। বলে ওঠে তুহিন– তো গান শোনা যাক এবার? যদিও আপনি পরিশ্রান্ত, তবুও।
রাকা– তার আগে একটু কফি হয়ে যাক?
তুহিন– তা হতে পারে। ও জিনিসটির কথা মনে হলেই জিভে জল আসে।
মিহিরবাবু– তুই বুঝলি কী করে মা, এখন আমাদের কফির প্রয়োজন?
– তোমার মেয়ে না আমি?
বাক্যটি কানে যেতেই কেমন আনমনা হয়ে গেলেন মুহূর্তের জন্যে। সামলে নিলেন নিজকে।
– তাই তো? ভুলে যাই মাঝে মাঝে।
এরপর সবার টেলিভিশনের চায়ের বিজ্ঞাপন স্টাইলে হাসি। ফ্ল্যাক্স থেকে সবার জন্য কফি ঢেলে পরিবেশন করে, হারমেনিয়াম টেনে বসে।
কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সচেতন হয়ে ওঠে কান এবং মন। কেমন গাঢ় ঘন কফি। এমন স্বাদের কফি সে কারও হাতেই খায় নি এর আগে। আঙুলের স্পর্শে কেঁপে উঠছে অর্গান। ডানকানা মাছের মতো সুরগুলো লাফিয়ে গেল ধবধবে রিড বেয়ে। সেদিন শুনেছিল পাশের ঘর থেকে। আজ সরাসরি সামনে বসে। সামনে বসে শিল্পীর গান শোনায় আছে অন্যরকম অনুভূতি।
রাকা কেমন চোখটাকে আধবোজা করে তন্ময় হয়ে গান করছে। শোনার চেয়েও মনে হয় দেখায় তৃপ্তি বেশি। তন্ময় হয়ে গাইছে। আর মন্ময় হয়ে শুনছে তুহিন–

আকাশ কি তার সব কথা খুলে কয়
তবুও পাখিরা কিছু কিছু বুঝে নেয়
(তাই) প্রাণ খুলে গান গায় ॥

কত তারা জ্বলে, কত তারা ঝরে
সীমাহীন বেদনায়,
কত প্রেম বুকে, জ্বলে সুখ দুঃখে
গোপনেই পুড়ে যায়।
কত ফুল যে ফুটেই শুকিয়ে যায়
(ওই) দূর মরু সাহারায় ॥

কত কথা মনে, রয়েছে গোপনে
ভালোবাসা লয়ে বুকে
বুঝেও বোঝ না, গহন বেদনা
যে কথা বলি না মুখে।
শত আশা পাখা মেলে বসে রয়
(তার) ওড়ার আকাশ যদি পায় ॥

এতক্ষণে খেয়াল হলো তুহিনের হাতে কফির পেয়ালা। ঠাণ্ডা। চুমুক দিল। হিমানীর মতো ঠাণ্ডা। তার মনে হলো– সত্যিই তো– আকাশ কি সব কথা খুলে বলে? বলে না। কেউই মনের কথাটা পুরো বলে না খুলে। বুকের কথা বুকেই থাকে। শাখায় যে কুঁড়ি লুকিয়ে থাকে তা আর আলোতে ফোটে না। বুকের কথা মুখে এসে প্রকাশ পায় না। তবুও তো অনেকেই বুঝে নেয় অনেক কিছু। হিমানী কি বোঝে নি কখনও তুহিনের মনের কথা? বলে ওঠে তুহিন– আশ্চর্য! এ কার গান? এত সুন্দর!!!
মিহিরবাবু– হেঁ হেঁ, বুঝলে, এ আমার মায়ের গান। নিজের লেখা।
তুহিন– আপনি এত সুন্দর ...!!!
'গান লেখেন' আর বলতে পারল না। থেমে গেল ওইটুকুই বলে। লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল রাকা। বেশ কিছুক্ষণ গান হলো এর পরে। শেষে আবার নিজের লেখা আর একটি গান ধরল–

এইটুকু শুধু এইটুকু ছিল চাওয়ার
নেই তো আর নেই কোনো গান গাওয়ার ॥

জীবনের পথের পাশে একটু হেসে
যায় চলে এমন করে সবাই শেষে।
নিজের কথা নিজেই গেয়ে
শ্রোতা শুধু নিজেই হয়ে
যাই চলে,
সময় যে হলো যাওয়ার ॥

গানের এই ভুবন জুড়ে হৃদয় ঘিরে
ধুয়েছি সকল জ্বালা অশ্রু নীরে।
ব্যথা তবু কেউ বোঝে নি
সুরে তে সুর কেউ খোঁজে নি
চাই যে কী,
কী যে আছে চাওয়ার ॥

তুহিন ভাবছে সে তার মনের কথাটা জানল কী করে? তার নিজের কথাগুলোই যেন বসিয়ে দিয়েছে ওই গানে। আসলে কী যে চাই, কী যে চাওয়ার আছে, তাই বুঝি না। শুধু না পাওয়ার যন্ত্রণায় কষ্ট পাই। জীবনটাই একটা কষ্ট-বিলাস।
রাত এগারটা। খাবার টেবিল। খেতে খেতেই পরিবেশন করছে রাকা। খিচুড়ি। সাথে ইলিশ মাছ ভাজা। সাথে আলুর চিপস্ আর পাপড় ভাজা। শেষ হলে মুরগির ঝাল ফ্রাই।
কথা বলছেন মিহিরবাবু– কাল কিন্তু বিজয়া দশমী। বিসর্জন। প্রতিমা বিসর্জন। আচ্ছা তুহিন, কালও না হয় এখানেই খেলে? তুমি তো একা, শুধু শুধু রান্নার ঝামেলা? –এই দ্যাখো, তুমি বলে ফেলেছি আপনাকে।
তুহিন– না, না, ঠিকই করেছেন। আমি তো আপনার ছেলেরই মতো?
মিহিরবাবু– আচ্ছা, আচ্ছা, তা ঠিক, তা ঠিক।
রানের একখানা মাংস তুলে নেয় তুহিন। মুখে দেবে। উঠিয়েওছে হাতে। হঠাৎ মনে হলো– হয়ত একটু আগেই জীবিত ছিল এ জীবটি। লাফাত। ডাকত। আর এখন যাবে আমার পেটের মধ্যে? সাপের পেটের মধ্যে চলে যায় যেমন জীবন্ত ব্যাঙ। কিংবা বাঘের পেটে হরিণ শিশু। ওরা যদি রান্না করতে জানত তাহলে আর কাঁচা খেত না। একটা জন্তুর পেটে আর একটা জীব চলে যাচ্ছে অনায়াসে।
আশ্চর্য! এই হলো গিয়ে জীব-জগতের ধর্ম? জীবের শত্রু জীব। মানুষ কেন জীব হত্যা করে? চালান করে দেয় পেটের ভেতর? তা-ও কত কায়দা-কানুন? তুহিনের মনে হলো মানুষ হলো শ্রেষ্ঠ পশু। সভ্য পশু। পশুতেই তো পশু শিকার করে। আর ভাবতে পারে না তুহিন। সে-ও অন্যতম এক পশু। এই পশু জীবনের কী প্রয়োজন তাহলে? এই পশু পশু খেলা তার ভালো লাগে না। না, সে পারবে না একটা জীব হয়ে অন্য একটা জীবকে খেতে– যা সব পশুতেই করে। না, আর খাবে না সে কোনোদিন কোনো মাংস। সে দেখতে পায় তার পেটের মধ্যে একটা নদী। সেই নদীর জলে ছুটছে দুরন্ত এক রুপালি ইলিশ। একটু আগের খাওয়া সেই ইলিশ। হঠাৎ বমি এল তার। মাথা কেমন করছে। উঠে পড়ল। না, আর খাবে না সে। আর না। দাঁড়ায়। সামনে দেখতে পায় দু'জন পশু। তারা কোনো জীবকে খাচ্ছে। বিস্মিত মিহিরবাবু বলে ওঠেন– এ কী? অমন করছ কেন? কোনো সমস্যা?

তুহিন– না। তবে আমি আর খাব না।
রাকা– হঠাৎ কী হলো আপনার?
মিহিরবাবু– কেন, খাবে না কেন?
তুহিন– আমি মাংস খাব না আর।
রাকা– আগে তো বলেন নি আপনি মাংস খান না?
তুহিন– খেতাম। এখন থেকে খাব না আর।
দু'জনেই– সে কী?
রাকা– নিশ্চই রান্না খারাপ হয়েছে?
তুহিন– না। না। মনে হলো তাই।

মনে মনে একটু ক্ষুণ্ন হলো রাকা। ভাবল– লোকটা পাগল নাকি? একটু আগেই হাঁটা শুরু করেছিল। এখন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল খাবার মাঝখানে। বড় অদ্ভুত আচরণ। বড় আশ্চর্য লাগছে বিষয়টা রাকার কাছে। এর আগে কখনও কাউকে এরকম আচরণ করতে দেখে নি রাকা। তাই বিস্মিত হলো।
মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তা। খাবার অসমাপ্ত রেখেই খাওয়া শেষ করল তুহিন। হাত ধোয়ার প্রয়োজন মনে হয় নি। বিক্ষিপ্ত কিছু ভাবনা তাকে তাড়িত করছে। আবার মনে পড়ছে, পৃথিবীটাই একটা চিড়িয়াখানা। ছোট ছোট খাঁচায় বন্দি না থাকলে পশুরা, একে অপরকেই খেয়ে ফেলত। মানুষকেও খেয়ে ফেলত। মাৎস্য-নীতি। বড় ছোটকে খায়। সবল দুর্বলকে খায়। পশু মানুষকে খায়। মানুষ পশুকে খায়। পশু পশুকে খায়। মানুষ মানুষকে খায়। বড় অদ্ভুত, বড় রহস্যময় এ পৃথিবী।

পাঁচ

দাদা এসছে শুনে ছুটে এল হিমানী। যে ঘরে ব্যাগ রয়েছে। ভারি খুশি সে। ভাবতেই পারে নি দাদা এসে পৌঁছুবে। যে চিঠি লিখেছে, না এসে পারে? সে তার বোন শিবানীকে সাজাচ্ছিল ওঘরে। শিবানী তার পিসির মেয়ে। এবং একমাত্র সন্তান। পিসি তার বিধবা। হিমানীর বাবার ইচ্ছে দু'টো মেয়েই তার; সে-ই বিয়ে দেবে দু'জনকে তার বাড়িতে বসে। তাই শিবানীর বিয়ে এ বাড়িতে বসেই। হ্যাজাকের আলোয় শিবানীকেই হিমানী লাগছিল তুহিনের কাছে। পেছন ফিরে থাকায় হিমানীকে দেখতে পায় নি। তাই ভুল বুঝে চলে এসেছে তুহিন। ভেবেছিল হিমানীর বিয়ে। তাই রাগে অভিমানে আর কোনো খোঁজ নেয় নি তুহিন। তিনটি বছর চলে গেল। হিমানীও আর লেখে নি। তুহিন ভেবেছে– বিয়ে হয়ে গেলেই পাল্টে যায় মেয়েরা। পর হয়ে যায়। স্বামী পেয়ে সব ভুলে যায়। তাই একটা চিঠি পর্যন্ত লিখল না সে তুহিনকে। পারল না লিখে। পারে মানুষ এমনই।

ওদিকে তুহিনকে ঘরে না পেয়ে হিমানী বাইরে এল। বাইরে খুঁজল। কোথাও নেই। ভাবল নিশ্চয় পুকুর পাড়ের জ্যোৎস্নায় গেছে জোনাকির পাশে। তিনি আবার কবি মানুষ কিনা? কবিরা হলো পাগল। তবে ভালো লাগে এ পাগলদের। না। পুকুর পাড়ে নেই। ভাবল– জ্যোৎস্নার গমক্ষেতে যেতে পারে। না। নেই। সেখানেও তুহিন নেই। শুধু কুয়াশার হাল্কা আস্তরণ। তুহিন কোথাও নেই। অথচ ছিল। হাওয়া। কিন্তু ব্যাগ আছে। তাহলে? কোথায় গেল? অতএব অপেক্ষা। বর এল। বরযাত্রী এল। তুহিন এল না। ধীরে ধীরে বুঝতে পারল, কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে। কিন্তু কী সেই কারণ? খুঁজে পেল না। ভাবল– এসে হয়ত বসে ছিল। আমি কাছে যাই নি বলেই হয়ত চলে গেছে। আমি কি দেখেছি, যে যাব? তাছাড়া এদিকে ব্যস্ত থাকায় কেউ বলেও নি আমাকে।

বাবার উপর ভীষণ রাগ হলো– কেন যে বলল না দাদা এসছে। তুহিনের উপরও রাগ হলো– বিয়ে বাড়ির ব্যস্ততা। না-ই দেখতে পারি। তাই বলে রাগ করে চলে যাওয়া? বেশ যাক্। আর লিখব না চিঠি। এত রাগ? কী এমন দোষ করেছি যে রাগ করে চলে যাবে? বেশ ভালো! সব ভালো। সবাই ভালো। খারাপ শুধু আমি। কুয়াশা দানা বাঁধল হিমানীর বুকে। জগতের সমস্ত আভিমান এসে ভর করল তার চোখের পাতায়। বাড়িতে গিজগিজ করছে লোক। অনেক লোকের সমাগম বলেই নিরিবিলি পরিবেশ পাওয়া গেল কান্নার। সবাই ব্যস্ত সবার কাজে। কে করে কার খোঁজ? হিমানী চলে যায় হাসনাহেনার ঝোপের পাশে। অনেক্ষণ কেঁদে হাল্কা হয় কিছুটা। ফিরে আসে ঘরে। কিন্তু বিয়ে বাড়ির আনন্দ; এই হাসি, উচ্ছলতা কিছুই ছোঁয় না তাকে। ঢোলকের বাজনা, সানাইয়ের সুর সবই বিস্বাদ ঠেকে তার কাছে। নিজেকে বড় বেমানান লাগে এই উল্লাসের ভিড়ে। সে একটু একা হতে চায়। পারে না। চারপাশ তার একাকিত্ব কেড়ে নেয় সন্ত্রাসীর মতো। পুরো আনন্দটাই তার মাটি। সে তো সুবাতাস চেয়েছিল? অথচ তা বৈশাখী ঝড় হয়ে, প্রভঞ্জন হয়ে ভেঙে দিল তার সযত্নে সাজানো স্বপ্নের বাগান। বড় একা লাগে। আজ তার বড় নিঃস্ব লাগে। নিঃসঙ্গ লাগে। স্বপ্নের কথা তার স্বপ্নেই থেকে যায়। বলি বলি করেও বলা হয় নি তার মনের কথা। বনফুলের মতো তার কথারা অগোচরে ফুটে, সবার অলক্ষ্যেই ঝরে যায়।

ভেঙে যায় বিয়ে বাড়ির মিলনমেলা। শিবানী চলে যায় সুখের পালকি চড়ে শ্বশুরবাড়ি। আত্মীয়রা চলে যায় যথাসময়ে। বাড়িটা শূন্য খাঁ খাঁ করে। বাবা চলে যায় কাজে। তুহিনের ফেলে যাওয়া ব্যাগটা আঁকড়ে ডুকরে কাঁদতে থাকে হিমানী। এক সময় ব্যাগের চেনটা খোলে। সেই চিরচেনা প্রিয় গন্ধটা এসে নাকে লাগে। সে বিহ্বল হয় আরও। ব্যাগে অন্যান্য জিনিসের সাথে নতুন একটা শাড়ি। বালুচরি। আর শেষের কবিতা। বুঝতে বাকি থাকে না, এ সব হিমানীর জন্যই আনা। গ্রীষ্মের চঞ্চল ঝর্ণার মতো হিমানীর কষ্টরাশি চোখ বেয়ে নেমে এলো দ্রুত। ভীষণ এক অভিমান দানা বাঁধল মনে। এই তবে স্বপ্নের শেষ। আর কোনো ডাক সে ডাকবে না বাইরে থেকে। এবার অপেক্ষার পালা।

ব্যস। বন্ধ হয়ে গেল এরপর তুহিনকে চিঠি লেখা হিমানীর। বন্ধ। অভিমানী মেঘ ফসিল হয়ে গেল। তুহিনও আর লেখে নি কোনো চিঠি। রাখে নি কোনো যোগাযোগ। খোঁজ। আজ প্রায় তিন বছর।

হিমানী কলেজে যায়। ফিরে আসে বাড়ি। মন বসে না পড়ায়। মন বসে না কাজে। যে ছিল আগে ঝর্ণার মতো চঞ্চল, প্রজাপতির মতো উচ্ছল; আজ সে অকস্মাৎ পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে রয়। মনের অজান্তে একাকি গড়া স্বপ্নসৌধ ভেঙে খান খান হয়ে যায়। পাথরে ফোটে না আর কোনো সুগন্ধি ফুল। তাই সে নিজেই ফুল ফুটিয়ে যায় পুকুরপাড়ে, উঠোনের পাশে। রজনীগন্ধা তুহিনের প্রিয় ফুল। প্রাণ ভ'রে সে রজনীগন্ধার চাষ করে। সেবার তুহিন যে ফুলদানিটা এনেছিল, রোজ সে তাতে রজনীগন্ধার ডাঁটা ভ'রে রাখে। সন্ধে হলেই তীব্র গন্ধে ছেয়ে ফেলে সারা ঘর। ফুলের সুবাস যেন তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে রাখে। সে তার নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ পায়; তুহিনের অস্তিত্ব টের পায়। এটাই তার পরম পাওয়া।

মেঘশিমুল থেকে ফেরার পর মায়ের অসুস্থতার খবর এল তুহিনের। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান তুহিন। বাবা মারা যান ছেলেবেলায়। স্মৃতি আবছা। সে তাই এত আদরের। মাকে ছাড়া তার আর তেমন কেউ নেই আপনজন। খবরটা পেয়েই চলে যায় কুমিল্লা, মায়ের কাছে। মা বাঁচলেন না। তবে মারা যাবার আগে ক'দিন কাছে পেয়েছিল

মাকে। সপ্তাহখানেক ভুগে তাকে একা রেখে চলে গেলেন মা। এ শোক তাকে পাগল করে দিল। জগৎ-সংসার তুহিনের কাছে বিস্বাদ হয়ে পড়ল। মেঘশিমুলের কষ্ট, আর মায়ের শোক– দু'টো মিলে তুহিনকে দুমড়ে, মুষড়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল। তুহিন এবার সম্পূর্ণ একা। একা।

নীরবতা দীর্ঘ হয় হিমানী ও তুহিনের।

বাড়িতে মা ছাড়া আর কেউই ছিল না তার। একাদের এক বাড়ি। পাশের বাড়ির সোলেমান চাচার মেয়ে রওশনই শেষ দিকে দেখাশুনা করেছে মায়ের। কলেজে পড়ে। বাবার ছেলেবেলার বন্ধু সোলেমান চাচা। সকাল-বিকাল সারাক্ষণই প্রায় মায়ের কাছে থাকত রওশন। ওষুধ খাওয়াত। এটা সেটা এগিয়ে দিত। যত্ন-আত্তি করত। সঙ্গ দিত। মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে খাবার রান্না করে আনত। পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল রওশন। মা খুব পছন্দ করত রওশনকে। রওশনও চাচি বলতে অজ্ঞান। মায়ের মৃত্যুর পর তার সে কী কান্না! যেন তার নিজেরই মা মরে গেছে। সে যেন মাতৃহারা হয়েছে। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা ছিল না তুহিনের।
সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল তুহিনের। কিচ্ছু ভালো লাগছিল না। সময় মতো খেত না। স্নান করত না। ঘুমোত না। জীবনের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল। এই মেয়েটিই আবার তাকে ফিরিয়ে আনে স্বাভাবিক জীবনে। মায়ের মমতা, আদর, সোহাগ, শাসন দিয়ে তুহিনকে বুঝিয়ে দিল জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে যায় নি। এতটুকুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। আরও অনেক পথ বাকি জীবনের। ভেঙে পড়লে চলবে না। অনেক দূর যেতে হবে তাকে। মেয়েরা সত্যি মায়ের জাত। কত কম বয়সে কত কিছু বোঝে। তার চেয়ে ছোট হয়েও সুনিপুণ হাতে কেমন গুছিয়ে রাখছে সব। কিছু না হয়েও রওশন যেন তার অনেক কিছু। একেই বলে বুঝি আত্মীয়তা! কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তুহিনের বুক। চাচা-চাচিও প্রায়ই আসেন। এটা সেটা রান্না করে নিয়ে আসেন। এরা যতটা তার জন্য ভাবে, অন্য কেউই আর তেমন করে ভাবে না। কখন, কোন ফাঁকে রওশন তার ময়লা জামা-কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে রাখে; তা সে টেরও পায় না। এমনি করে কেমন এক মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে যায় তুহিন। ঠিক যেন নিজের ছোট বোনটির মতো। ঢাকা ফিরে আসার দিন কখন যেন রওশন তার ব্যাগটা পর্যন্তও গুছিয়ে রেখেছে। গাছপাকা দু'টো ডালিম দিয়ে বলেছে–
– ভাইয়া, হলে গিয়ে খেও। আর শরীরের যত্ন নিও। মাথার দিব্যি থাকল কিন্তু। মন খারাপ করো না। মাঝে মাঝে বাড়িতে এসো। আমরা তো রইলাম।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে তুহিন চাকরিতে যোগদান করে। বেসরকারি কলেজের দর্শনের প্রভাষক। ঢাকাতেই। কলেজের কাছেই একটা বাসা ভাড়া নেয়। ছোট্ট। একাই থাকে। কখনও নিজে, কখনও বুয়া রান্না করে দিয়ে যায়। একলা একা কাটে সময় বই পড়ে, গান শুনে, কবিতা লিখে। আর তুরাগ নদীর পাড় ধরে দীর্ঘ হেঁটে বেড়ানোয়। এভাবেই চলে দিন। কষ্ট এবং অভিমান জমা হতে থাকে বুকে। তা যেন হিমালয়ের শিখরে জমা বরফের মতো। গলে না। তবে গললে প্লাবন নিশ্চিত। হিমানীর কথা পুরনো ক্ষতের মতো জ্বলে জ্বলে ওঠে। ক্ষত ঘষা দিলেই দগদগে ঘা। রক্তক্ষরণ ঘটায়। যন্ত্রণা দেয়। আশ্বিন এলেই তাই মেঘশিমুল ঢুকে পড়ে মাথার ভেতর। তুহিনকে পাগল করে দেয়।
দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। স্মৃতিতে ধুলো জমে। কিন্তু যায় না। ধুলো পড়া তানপুরা ঝাড়া দিলে যেমন চকচকে হয়ে ওঠে। স্মৃতিও তেমনি ঝাড়া দিলে মোচড় দিয়ে ওঠে। বেজে ওঠে সুর। তানপুরায় বাঁধা সুরের মতো ব্যথা ওঠে টন্‌টন্ করে। সেতারের ঝালার মতো যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকে প্রাণ। তবুও প্রতীক্ষায় প্রহর কাটে। কেটে যায় কারও কারও দীর্ঘ দীর্ঘ কাল।
উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাসায় ফেরে তুহিন। কী হলো এ? এমন কেন হয়? কেন সে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারে না নিজেকে পৃথিবীর সাথে? জীবন মানে কী? জীবন মানে কি ক্রমশঃ আরও যন্ত্রণার দিকে ধাবিত হওয়া? জীবন মানেই কি আপোষ জীবনের সাথে? অথচ তুহিন পারে না আপোষ করতে কারো সাথে। বেঁচে থাকা মানে অভিযোজন ক্ষমতা। Adaptation. জগতের সাথে প্রতি মুহূর্তে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকাই অভিযোজন। পাপের সাথে, পুণ্যের সাথে, ন্যায়ের সাথে, ঘৃণার সাথে, ভালোবাসার সাথে আপোষ করে, মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকাই জীবন। সুখের সাথে, দুঃখের সাথে, সত্যের সাথে, মিথ্যের সাথে অভিনয় করে বাঁচাই জীবন। বাস্তবের সাথে অভিনয়ই বাস্তবতা। এমন বাস্তবতার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই আমার এমন বাঁচার, এমন জীবনের। কিন্তু মৃত্যুও তো হচ্ছে না। আত্মহত্যা পছন্দ নয় তার। নয়ত প্রতি মুহূর্তেই, ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে। কী অর্থ এই বেঁচে থাকার? কেন এই বাঁচাবাঁচি? কেন এই সত্য-মিথ্যের ভড়ং? কেন এই অভিনয়? শেক্সপিয়র ঠিকই বলেছেন– পৃথিবী এক বিরাট রঙ্গমঞ্চ, আর তার মানুষ হলো অভিনেতা-অভিনেত্রী। সবাই। কম-বেশি। তুহিনের মনে হয়– জীবনটাই কষ্ট-বিলাস। শুধু কষ্ট কষ্ট খেলা। আর ভালো লাগে না। প্রতি মুহূর্তে মরে যেতে ইচ্ছে করে। তাই সে মরে না।

আত্মহত্যা করে না। বেঁচে থাকে যন্ত্রণা করে পান জীবনভর। দেখে যেতে চায় সে যন্ত্রণার স্বরূপ। দেখবে সে এর শেষ কোথায়। তাই সে বেঁচে থাকে যন্ত্রণার রঙে জীবন রাঙাতে।
বাসায় ফিরে সে রাতের পোশাক পরে। টেবিলে বসে। না। মাথায় কিচ্ছু আসছে না। যখনই কোনো লেখা আসে না, তখনই যন্ত্রণা আসে। ঘণ্টাখানেক বসে থেকে যন্ত্রণায় ভার মাথা। টনটন করে। যন্ত্রণা নিংড়ে ফোঁটা ফোঁটা কষ্টের রস নিয়ে শুরু করল লেখা–

জন্মই এক আপোষ আমার
এ পৃথিবীর সাথে,
আপোষ আমার–
পাপের সাথে, পুণ্যের সাথে,
মানুষের সাথে
সময় এবং সমাজের সাথে;
আপোষ নিজের সাথে;
বেঁচে থাকাই আপোষ জীবনের সাথে।

মনে নেই প্রথম কেঁদে ওঠার কথা
হয়ত জিভে মাতৃস্তনের স্পর্শে
কান্না ভুলেছি,
সে আমার প্রথম আপোষ,
আপোষ আমার মায়ের সাথে।

বাবার হাত ধরে হোঁচট খেতে খেতে
হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে শিখেছি
সে আপোষ আমার বাবার সাথে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছি
আকাশ আকাশের মতো,
জীবন আঁকল সেখানে নীলের আল্‌পনা
শূন্যের রঙ হলো নীল,
আপোষ আমার দৃষ্টির সাথে।
মায়ের শবদেহ শয্যায় রেখে
আমি সাবালক হতে চেয়েছি
অশ্রু লুকিয়ে,
আপোষ আমার কৈশোরের সাথে।

ভালোবাসার মেঘ ছিল ভেসে
বুকের বাতাসে,
প্রণয়ের বৃষ্টি দেই নি ঝরাতে;
আপোষ আমার সভ্যতার সাথে।
আপোষ আমার অশ্রুর সাথে
আপোষ সংগ্রামের সাথে
আপোষ পথের সাথে, প্রকৃতির সাথে
আপোষ শ্রমের সাথে
আপোষ ঘামের সাথে
আপোষ রক্তের সাথে
আপোষ চির মনন এবং মেধার সাথে
জীবনটাই আপোষ জীবনের সাথে।

লেখাটা শেষ করে কাৎ হয়ে পড়ল বিছানায়। বিষণ্ন অবসন্নতা অক্টোপাসের মতো জাপটে ধরল তাকে। কোনো লেখা শেষ হলে এত কষ্ট লাগে শরীরে। ক্লান্তি!!! মনে হয় আখের ছোবড়া। আখ পিষে রস বের করে ছোবড়া করে ছেড়ে দেয়।

দুঃস্বপ্নের অমানিশা থেকে হঠাৎ জেগে ওঠে তুহিন। কেটে যায় ঘুমের ঘোর। কাটে না স্বপ্নের নেশা। এ কেমন ভয়ঙ্কর বীভৎস স্বপ্ন! গলা শুকিয়ে কাঠ। আলো জ্বলেই ছিল। নেভানো হয় নি। দেয়ালে টাঙানো আয়নাটায় একবার দেখে নিল চেহারাটা। দেখে নিল নিজকে। সব ঠিকই আছে। কেবল উস্‌কো খুশকো। ঠিকই আছে? তবে এমনধারা স্বপ্ন দেখল কেন? নাকি আসলে চেহারাটা দেখা গেলেও নিজকে ঠিক মতো দেখা যায় না। বোঝা যায় না? ভেতরে লুকিয়ে থাকে এক পশু আমি? আয়না থেকে সরে এল। নিজকে দেখতেও তার লজ্জা লাগছিল। জগ থেকে ঢেলে এক গেলাস জল খেল। ভাবছে এমনধারা কি শুধু ওরই হয়, নাকি অন্যেরও হয়? এমন অদ্ভুত আর উদ্ভট স্বপ্ন কি শুধু সে-ই দেখে, নাকি অন্য কেউ কেউও দেখে? ভাবল– কী অর্থ হয় এ ধরনের স্বপ্নের?

ডায়েরি সে লেখে না। অভ্যেস নেই। ওটা তার পছন্দনীয় নয়। কী লাভ লিখে? কে পড়বে তার লেখা মরার পরে? ফালতু। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্ত, ঘটনা বা স্মৃতি বা স্বপ্ন সে লিখে রাখে। টুকে রাখে। মন থেকে হারিয়ে যাবার ভয়ে। সেগুলো সে অবসন্ন স্মৃতিতে ধরে রাখতে চায়। আজকের এ স্বপ্নটা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে তাকে। তাই সে ডায়েরি খুলেই বসল। ডায়েরি মানে লেখার খাতাটাই। রাত পৌনে তিনটা। যতটা সম্ভব মনে পড়ে স্বপ্নটা তাই লিখছে। তার ডায়েরি থেকে হুবহু তুলে ধরছি–

আমি একজন মানুষ– শিক্ষিত– সংস্কৃতিমান এবং মার্জিত রুচির। সমাজের সম্মানিত একজন। দর্শনের শিক্ষক। গোধূলি বেলায় আমি হাঁটছি একাকি। নীল আকাশের সূর্যাস্তের নিচে। নদীর পাড়ের কচি সবুজ নরম ঘাসে খালি পা ফেলে। হাঁটছি আর দেখছি। দেখছি আর অনুভব করছি। অনুভব করছি আর আকণ্ঠ পান করছি প্রকৃতি– প্রকৃতির শোভা। আমি বিচরণ করছি ওই আকাশ-নীলের তলে সবুজ ঘাসের মাঠে। নদীর পাড়ে। সায়াহ্নে। অকস্মাৎ একটি তারা ছুটে এসে পড়ল নদীতে। আকাশের নীল থেকে। আগুনের গোলা। প্রচণ্ড আলো আর উত্তাপ। পড়ল নদীতে। যেন মাছরাঙা পাখি এক ঝুপ পুকুরের জলে। ছলকে উঠল জল। ছিটে এল আমার গায়ে। মুখে। যেহেতু গায়ে জামা; তাই গায়ে লাগল না। অনাবৃত অংশগুলোতে লাগল। হাতে লাগল, মুখে লাগল। পায়ে লাগল। মাথায় লাগল। তারার আগুনে পোড়া জল। কুৎসিত জল। সহসা পরিবর্তন হতে লাগল আমার। ধীরে ধীরে নুয়ে এলাম আমি। কুঁজো হয়ে। আমার মাথা। ঘাড়। দেহ। সব। নুয়ে গেলাম। নুয়ে যেতে যেতে হাত দু'টো মাটিতে ঠেকল। আর ক্রমশঃ দু'টো হাত রূপান্তরিত হলো দু'টো পায়ে। অর্থাৎ চতুষ্পদ হয়ে গেলাম। হাত বলে কিছুই থাকল না আমার। যা থাকল তা শুধু চারটে পা। তাতে খুড় হলো। আস্তে আস্তে লম্বা হয়ে এল মুখ। লম্বা হয়ে এল দু'টো কান। চ্যাপ্টা হলো নাক। ঘাড়ে লোম গজাল। চোয়ালে বড় হলো দাঁত। পেছনে লেজ হলো না। কারণ জল লাগে নি। পোশাক পরা ছিলাম বলেই পোশাক পরা অংশটুকু বাদে আপাদমস্তক আমি একজন পশু হয়ে গেলাম। 'একটা' না বলে 'একজন' বলছি এ কারণে যে, তখনও আমি পোশাকপরা।

সূক্ষ্ম চেতনা বিলুপ্ত হলেও স্মৃতি গেল থেকে। আমি বলতে এবং লিখতে ভুলে গেলাম। কিন্তু, শুনতে এবং বুঝতে পারি। আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। প্রশ্ন– এ কী হলো? আমি কেন এমন হলাম? আকাশ কেন ছুঁড়ে দিল বিধ্বস্ত তারকা? চোখে আমার খাঁ খাঁ শূন্যতা। আকাশের নীলে লেখা উঠল ফুটে। সুন্দর লেখা। লিখতে পারি না। কিন্তু পড়তে পারি লেখা। পড়লাম। আকাশের নীলে মেঘের অক্ষরে লেখা রয়েছে একটি শব্দ– 'গাধা'। যেহেতু নদীর তীরে আয়না নেই, তাই দেখতে পারলাম না আমার চেহারাটা। তাই জলের কাছেই ছুটে গেলাম। এই মানব গাধার, সদ্য হওয়া গাধার, যে অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক পশু– চেহারাটা দেখতে। নদীর জলটা পুড়ে কাঠকয়লা। কালো। তাই দেখতে পেলাম না আমার চেহারা। একজন অর্ধমানব-অর্ধপশু-অর্ধঅধ্যাপক। হাঁটছি আর ভাবছি। ঘাস খাচ্ছি না। ও আমি খাই না। আমার প্রিয় খাদ্য নয়। আমার প্রিয় তন্দুরি রুটি আর খাসির কলিজি কিংবা মুরগির ঝালফ্রাই আর Mango Juice. তাই ঘাস খাচ্ছিলাম না। ঘাস দেখছিলাম। ঘন সবুজ।

দু'টো কিশোর এল ডানপিটে। তারা কখনও গাধা দেখে নি। তাছাড়া পোশাক পরা গাধা। হেঁ হেঁ করে হাসল। থামল। কাছে এল কিশোরদ্বয়। রসিকতা করে বলল– কেঁ হেঁ আপনি পশুমশাই? আমি বলতে চাইলাম– 'গাধা'। পারলাম না। কারণ বলতে পারি না কথা। শুধু শুনতে পারি। বোঝাতে চাইলাম– 'পশু-মানব'। পারলাম না। তারা রঙ্গ করে বলল– 'সভ্য পশু, দ্যাখ পোশাক পরেছে? চল্ শালাকে পোশাক খুলে ল্যাংটো করে দিই?' যেমনি কওয়া, তেমনি কাজ। খুলে নিল পোশাক। আমি বাধা দিলাম না। কারণ, কোনো পশুর অধিকার নেই পোশাক পরার। পোশাক পেয়ে ওরা মহা খুশি। ওদের খুশি দেখে চোখে জল এল আমার। অন্যের খুশিতে আনন্দে জল আসে আমার চোখে। চোখে জল এল। কিন্তু ঝরল না। ওরা অবাক। পশুটার ভেতরটা মানুষের মতো। গা-গতর, সব। বিস্মিত ওরা। এর আগে কখনও এমন পশু দেখে নি ওরা। তাহলে কি এ পশুটার হৃদয়ও আছে? হৃদয় তো থাকে বুকের ভেতর? বুক তো মানুষের মতো? নাকি মাথায় থাকে হৃদয়? মাথা তো পশুর মতো? তাহলে? বলাবলি করছে ওরা– 'এ পশু-মানব শোবে কোথায়? খাবে কী? এর জন্য তো কোনো শোবার বন্দোবস্তও নেই পৃথিবীতে? নেই

খাবারের বন্দোবস্ত। ওরা ভাবছে। ভাবছে আর দেখছে। দেখছে আর ভাবছে। উলঙ্গ এই আমার লজ্জা লাগছে না কোনো। কারণ, পশুর কোনো লজ্জা নেই। লজ্জা থাকে না। পশুতে পোশাক পরে না। তাছাড়া, পোশাকের নিচে সবাই তো উলঙ্গ। আমি না হয় পোশাক ছাড়াই উলঙ্গ! মানুষ সভ্যতার অভিনয় করে পশু হয়েই। আমি না হয় সভ্য-পশু দৃশ্যতই! একজন পশু-মানব, নাকি মানব পশু? এই আমি পশু-মানব কিংবা মানব-পশু একজন অধ্যাপক-সাহিত্যিক-দার্শনিক– আমি ঘাস খাই না। দাঁড়িয়ে থাকি সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে অন্ধকারে মিশে যাব বলে; মিশে যাব বলে অন্ধকারে– অন্ধকারে– অন্ধকারে– গাঢ় কালো অন্ধকারে–

লেখাটা শেষ করে জানালায় বসে তুহিন। ডুবে গেছে নবমীর চাঁদ। বাইরে দুরন্ত সাগর। ডাকছে তাকে। ঘুম আসছে না। অসহ্য লাগছে ঘর। বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চলে যায় সৈকতে। পাশাপাশি দু'টো উপলখণ্ড। মানুষ নেই কোনো। বসে পড়ল একটাতে। এলোপাথাড়ি ভাবনাগুলো ঢেউয়ের রাবারে মুছে দিল। হঠাৎ মনে হলো কেউ একজন এসে বসল। পাশে। পাশের উপলখণ্ডে। নিঃশব্দে। নিঃশব্দের ভেতরও কোনো শব্দ হলো মনে হলো। চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ। বেশ মিষ্টি। তবে কি রাকা? রাকার চেহারাটা ঠিক ফর্সাও নয়, কালোও নয়; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। দীর্ঘাঙ্গী। কোথায় যেন এক চমৎকারিত্ব লুকিয়ে। কেমন এক আদিমতার ছাপ আছে চেহারাটার মধ্যে। কোথায় যেন একটু উপজাতীয় ছাঁচ আছে। সব মিলিয়ে সরলা-সুন্দর। যেমন সাঁওতালি কিশোরী। পাশ ফিরে তাকাল তুহিন। সে কী? কেউ নেই পাশে। তাহলে কি সব তার মনের ভুল? এমন ভুল কেন হয়? তুহিন কি এ গ্রহের কেউ নয়? তবে কি অন্য গ্রহের? ভিন্ন গ্রহের? এ পৃথিবীর নয় সে? তাহলে বারবার এমন কেন হয়? কেন প্রতারণা করে পৃথিবী? তবে কি সে পাগল হতে চলেছে? না, ভালো লাগে না আর এই পোকা-মাকড়ের জীবন। জীবন যদি মধুরই না হবে, শুধু হবে যন্ত্রণার– যদি ফুল না ফুটে শুধু হুলই ফুটবে, তবে কী প্রয়োজন এই ফালতু জীবনের? জীবনের উদ্দেশ্য খোঁজে তুহিন। পায় না। উত্তর অজানা। কেমন এক গোলক ধাঁধা– প্রহেলিকাচ্ছন্ন। বসে থাকে আর ভাবে। এক সময় ভোর হয়। আসলে কি হয়? ভোর? নাকি সেও প্রহেলিকা।

আজ দশমী। বিজয়ার বিকাল। মিহিরবাবু এলেন তুহিনের কাছে। 'চলো বাবা একটু ঘুরে আসি। ভালো লাগবে। আজও কিন্তু তুমি আমাদের ওখানে খাবে। কাল হয়ত খারাপ হয়েছিল রান্নাটা। মা আমার তারই আয়োজন করছে। ও আর আজ যাবে না।'

তুহিন– 'না, না, আমি এমনিই...'

মিহিরবাবু– যা হোক– বুঝতে পেরেছি– তোমার ভেতর কোনো একটা যন্ত্রণা আছে লুকিয়ে। যে কারণে এত অসহিষ্ণু তুমি। শোন, পৃথিবীতে যে কত যন্ত্রণা আছে, তার স্বরূপ যে কত জঘন্য, তুমি তা হয়ত জানো না। যে কারণে নিজের কষ্টটাকে বেশ বড় করে দেখছ তুমি। চলো, আজ এক চরম কষ্টের কথা বলব তোমাকে। তাহলে বুঝবে পৃথিবীতে ওর চেয়েও বড় কোনো কষ্ট আছে হয়তবা। বলে আমিও একটু হাল্কা হব।

অভিভূতের মতো হাঁটে সে মিহিরবাবুর পেছনে। বিকেলের সৈকতের জনারণ্য পেরিয়ে চলে যায় নির্জনের পুবে। খানিক দূরে। সেখানে দু'টো উপলে বসে দু'জন– যেখানে ঢেউ এসে উছলে পড়ে। আছড়ে পড়ে। একজন স্মৃতির ভাষ্যকার। অন্যজন নির্বাক শ্রোতা।

বেলা ডোবার বেশ দেরি তখনও। উদাস দৃষ্টি মেলে একমনে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন সমুদ্রের দিকে। হয়ত ঢেউয়ের বুকে খোঁজেন স্মৃতি। অনন্ত নীল জল লবণাক্ত। সাগর যেন আকাশের চোখ। তার যাবতীয় জল যেন আকাশের অশ্রু। হঠাৎ সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে উত্থিত হয় একটি শব্দ– দূর অতীত থেকে ভেসে আসে মেঘমন্দ্র একটি কণ্ঠস্বর–

আজ বাইশটা বছর যাবৎ বয়ে বেড়াচ্ছি এক দুঃসহ কষ্টের বোঝা। এই বাইশ বছর ধরে নানারূপে পরিবর্তিত হলো সেই কষ্ট। এক এক সময় এক এক স্বরূপ। একই কষ্টের এত স্বরূপ? কোন্‌টা ঠিক, আজও উঠতে পারি নি বুঝে। যখন যেটা শুনি বা দেখি, সেটাই মনে হয় চূড়ান্ত সত্য। কিছুদিন পর, সময়ের পরিবর্তনে দেখি সেটা সত্য ছিল না, ভুল ছিল। জানি অন্য সত্য। কোন্‌টা চূড়ান্ত আজও জানি না। তবে কষ্ট তাতে কমে না একটুও। বরং এক এক পরিবর্তনে কষ্টও আরও বেশি হয়ে ওঠে। তুমি জানো– রাকা আমার একমাত্র সন্তান, তাই না? কত বড় ভুল জানা। পৃথিবীর মানুষেরা এরকমই ভুল জানে। আচ্ছা তুহিন, তুমি কখনও আমাদের পরিবারের অন্যান্যদের কথা জিজ্ঞেস কর নি। রাকার মায়ের কথাও নয়। আসে নি কেন আমাদের সাথে? ইত্যাদি কিছুই না। হয়ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা ভদ্রজনোচিত নয় বলেই কর নি। সে যা হোক, তবু আজ আমি তোমাকে সব বলব। তুমি তাহলে যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। তাছাড়া, আমিও কিছুটা হাল্কা হব।

বাইশ বছর আগে শুরু আমার সেই কষ্টের। আজও সে কষ্ট নতুন নতুন করে কষ্ট দেয়। অথচ রাকাও জানে না আমার কষ্টের কথা। তাকে বলা যায় না। রাকার মায়ের নাম ছিল শ্যামলী। 'ছিল' বললাম কেন, তা পরে বুঝতে পারবে। না। মারা যায় নি। জীবিত। জানতে পারবে সবই। মন দিয়ে শোন। বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে বীরভূমের এক কলেজে চাকরি নেই ইংরেজি প্রভাষক হিসেবে। গতবার চাকরি থেকে অবসর নেই। বাইশ বছরের কষ্টের আগের সুখের পাঁচ-সাত বছরের একটু পরিচয় দিই। রাকার মা ছিল আমার ছাত্রী। দেখতে খুব সুন্দরী ছিল বলা

যাবে না। তবে বেশ সুশ্রী। তাছাড়া তার সহজতার মধ্যে যেন কী এক মোহ ছিল, আমাকে বিহ্বল করে দিত। শেষে কিনা ভালোবেসেই ফেললাম। বছর দুই এ ভালোবাসাবাসি চলল। তারপর বিয়ে করে ফেলি। আদর করে 'শ্যামা' বলে ডাকতাম। দু'জন দু'জনকে এত ভালোবাসতাম যে মনে হতো এর চেয়ে বেশি ভালোবাসা যায় না। এত ভালো কেউ কাউকে বাসতে পারে না পৃথিবীতে। সে কবিতা খুব পছন্দ করত। সুন্দর আবৃত্তি করতে পারত। দরাজ কণ্ঠ ছিল। বিয়ের পরে পাঁচ-ছয় বছর কেটে গেল, কোনো সন্তান হলো না। আমি তেমন গুরুত্ব দিলাম না। কিন্তু সন্তান কামনায় মরিয়া হয়ে উঠল শ্যামা। প্রত্যেক নারীই কি বিয়ের পরে মা হবার জন্য পাগল হয়ে যায়? কী জানি? আমাদের কোনো সন্তান হলো না। ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল শ্যামা। অবশেষে একদিন দু'জনে শরণাপন্ন হলাম ডাক্তারের কাছে।

দু'জনকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন– আমার সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নেই। জেনে সারাদিন কাঁদল শ্যামা। মা হবার বুঝি কোনো সম্ভাবনাই তার নেই। অনেক বুঝালাম। কিন্তু থেকে থেকে কেমন উদাসীন হয়ে যেত শ্যামা। খেত না। ঘুমুত না। কারও সাথে মন খুলে দু'টো কথা বলত না। দিন যায়, মাস যায়– সে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। আমার সাথেও তেমন কথা বলে না। ভালোবাসা কোথায় যে উড়ে গেল। সেই থেকেই কষ্টের শুরু। আসলে ভালোবাসায় একবার ভাঙন ধরলে তা আর রোধ করা যায় না। নদীর ভাঙনের মতো শুধু ভাঙতেই থাকে। শোন বাবা, কোনোদিন কাউকে ভালোবেসো না। ভালোবাসা শুধু ভাঙতেই জানে, গড়তে জানে না।

শ্যামার চক্ষুশূল হয়ে গেলাম আমি। যেন ভালোবাসাই আমার বড় অপরাধ। কেন শ্যামাকে ভালোবাসলাম? ভালো না বাসলে আজ তার এ দুর্গতি হতো না। তার চোখ এ কথাই বলে। আমি সব সহ্য করে যেতাম। কিন্তু, কত আর সহ্য করা যায় বলো? ওদিকে ডিভোর্সও করতে পারি না। লোকলজ্জার ভয়। আমি একজন প্রভাষক। নামও আছে একটু। তাছাড়া শ্যামাকে যে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি। আর ভালোবেসেই বিয়ে করেছি। সে ভালোবাসাও তো তাহলে মিথ্যে হয়ে যায়? তাই কষ্ট বুকে নিয়ে কাটাতাম। এক সময় মনে মনে এক সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে শ্যামার সন্তানও হবে, ও মা হবে, আর আমার ঘরও ছাড়তে হবে না ওর। সমাজের বুকে আমরা বেঁচে থাকব বাবা-মা হয়ে। এমন সিদ্ধান্ত। যা কোনো পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর জন্য মেনে নেয়া যন্ত্রণাদায়ক। তবু আমি সে সিদ্ধান্তই নিলাম। মারাত্মক এক সিদ্ধান্ত। জানি, কেউ জানবে না তা কোনোদিন।

সেইদিন থেকে শুরু হলো অভিনয়। অভিনয় পৃথিবীর সাথে। জগৎ এবং জীবনের সাথে। সমাজ এবং সংসারের সাথে। অথচ মানুষ জানে এটাই বাস্তবতা। কী আশ্চর্য, তাই না? মানুষ কত ভুল জানে? অথবা অনেক সত্যই জানে না। যা জানে, তা সত্যের কণামাত্র। অথচ তাই নিয়ে বড়াই করে। যা বলছিলাম– শ্যামাকে জানালাম আমার ভাবনার কথা। ও রাজি হলো না। আসলে ও ছিল সাধ্বী। পতিপ্রাণ। আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসত। আমি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে ভাবতে পারত না। সে বলল– 'দরকার নেই আমার মা হবার সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে। তুমি অমন কথা বলো না; আমি তা সইতে পারব না। আমি এমনই থাকব। শুধু তোমার ভালোবাসা যেন চিরদিন পাই। আমার কষ্ট আমাকে বইতে দাও। আমার পোড়া অদৃষ্ট।'

আমার প্রতি শ্যামার এই প্রগাঢ় ভালোবাসা আমাকে আরও বিহ্বল করে দিল। ভাবলাম– যেভাবেই হোক ওর কোলে সন্তান আমি দেবই। তাই দিনের পর দিন বুঝালাম– শুধু একটিবারের জন্য তুমি অন্য কোনো পুরুষের সাথে মিলিত হও, এতে তোমার সতীত্ব যাবে না। তাছাড়া আমিই তো তোমাকে এ কাজ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্য কেউ জানবে না। কোনো কিছুতেই রাজি হলো না শ্যামা। তবে দেখলাম আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছে শ্যামা। আবার আমাকে সহ্য করতে পারে। ভালোবাসে। হয়ত আমার উদারতায় ওর কষ্ট কেটে গেছে। কিন্তু, রাজি সে হলো না কোনোমতে।

আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মুনিম। সে ছিল ভোজন-রসিক। হাসিমুখো। সামান্য লাজুক। ভদ্র ছেলে। ছেলে না বলে যুবক বলা উচিত। আমরা একই বয়সী। আমি কলেজে পড়াই; আর মুনিম তখন বিশ্বভারতীতে পিএইচ.ডি. করছে। দর্শনে। আমার বাসায় প্রতিদিনই প্রায় আসত। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তার সাথে। মনে মনে ভাবলাম– ওকে দিয়েই কাজটা করাতে হবে। তারপর শ্যামা মুনিমকে ম্যানেজ করবে। অর্থাৎ আমি যে জানি বিষয়টা, এটাও মুনিমকে জানতে দেয়া হবে না। তাহলে হয়ত সহজ থাকতে পারব না কেউ কারও কাছে। একদিন শ্যামাকে বললাম মুনিমের কথা। আমি বাড়ি না থাকা অবস্থায় মুনিম যদি আসে, হাসি-তামাশা করবে, আদর করবে, রঙ্গ-রসের কথা বলবে, ওর মনটাকে টলাতে চেষ্টা করবে। তারপর সুযোগ বুঝে ওকে বিছানায় আহ্বান জানাবে। ব্যস। ওইদিনই। আর প্রয়োজন নেই। কাজ শেষ হলে মুনিমকে বলবে– সর্বনাশ হয়ে গেল, ক্ষণিকের আবেগে এ কী করে ফেললাম আমরা মুনিম? ছিঃ ছিঃ! ওকে ঠকালাম। না। আর কোনোদিন নয়। মুনিম, আপনাকে অনুরোধ, আর কোনোদিন এখানে আসবেন না। আর একথা যেন কেউ জানতে না পারে।'

শ্যামা হাসল। রাগও হলো। বলল– 'শুনলাম। বুঝলাম। কিন্তু, আমি পারব না।' সব বুঝানো ব্যর্থ হলো। তবু হাল আমি ছাড়লাম না। আমারও যেন তখন কেমন এক বাবা হবার মোহে পেয়ে বসেছে। বুঝাতে বুঝাতে একদিন শ্যামা বলল– 'আচ্ছা, এতই যখন বলছ, ভেবে দেখব।' সেই থেকে শ্যামা মুনিমের সাথে একটু বেশি পরিমাণে হাল্কা রসিকতা করে। দেখে আমার ভালোই লাগত। কারণ, আমি তো তাই-ই চাইছিলাম। বলে রাখা ভালো– মুনিম তখনও বিয়ে করে নি। তার প্রতিজ্ঞা ছিল কোনোদিন কারও সাথে সংসার করবে না। মানে বিয়ে করবে না। তার এ নারী বিদ্বেষের কারণ আমরা জানি না। সম্ভবতঃ এখনও সে বিয়ে করে নি।

মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ। সে ছিল আমার নতুন সুখের এবং কষ্টের শুরু। সুখ, নতুন অতিথি আসবে। কষ্ট, একজন স্বামী জানে তার স্ত্রী অন্যের শয্যাসঙ্গিনী। সে সময় একদিন সাঁওতাল পাড়ায় এক সুঠামদেহী যুবক নষ্ট মদ খেয়ে মারা যায়। নাম তার হাঁসদা। ছেলেটা দেখতে কালো হলেও বেশ সুন্দর ছিল। আমার ফাইফরমায়েশ খাটত। তাই কষ্ট পেয়েছিলাম খুব। আরও কষ্ট পেয়েছিলাম এ কারণে যে, পরোক্ষভাবে নিজকেই দায়ী করছিলাম আমি। তারও কারণ আছে। আমি তখন নিয়মিত drink করতাম। ওই সময় আমার শেলফ থেকে একটা বোতল হারানো যায়। ওর মারা যাবার খবর শুনে গিয়ে বোতলটা দেখে আঁৎকে উঠেছিলাম। কারণ, ওই বোতলটিই ছিল আমার হারানো বোতল। অবশ্য কাউকে বলি নি সে কথা। শুধু গোপন এক পাপবোধ কাজ করছিল ভেতরে ভেতরে আমার। তবে বিস্মিত হয়েছিলাম– হাঁসদা কখনও কোনো জিনিস ধরত না, চুরি করত না। খেতে ইচ্ছে করলে চেয়ে খেত। ও কেন শেষে চুরি করতে গেল? বাসায় ফিরে শ্যামাকে বললাম। শ্যামা শান্তভাবেই গ্রহণ করল বিষয়টি। ও বলল– ভাগ্যিস ওটা সে চুরি করে নিয়েছিল, নয়ত তুমি খেলে কী হতো বল তো? বরং ভালোই হয়েছে। একটা সাঁওতাল মরেছে, তবু তুমি তো বেঁচে আছ? তোমার মতো একজন গুণীর প্রয়োজন এ পৃথিবীর। ওর কোনো প্রয়োজন নেই। ও মরে তোমাকে বাঁচিয়ে গেল। বস্তুতঃ শ্যামার কথাগুলো সেদিন মোটেই ভালো লাগে নি আমার। ও আরও বলল– মানুষ দেখে মানুষ চেনা যায় না। দেখো না কোনোদিন কিছু না বলে ধরল না, অথচ শেষে কিনা তোমার হুইস্কির বোতল চুরি?

আমি কিছুই বললাম না। বস্তুতঃ সেদিনের কোনো কথাই শ্যামার ভালো লাগছিল না। তাই চুপ করে বসে থাকলাম। শ্যামা এসে কপালে হাত রেখে আমাকে বলল– দুশ্চিন্তা করছ কেন, দেখো, তোমার সন্তান হবে এবারে। কী এবার খুশি তো? 'সত্যি' বলে জড়িয়ে ধরলাম শ্যামাকে। কিন্তু, কী এক ঘৃণায় ছাড়িয়ে নিলাম নিজকে। অবশ্য বুঝতে দিলাম না তা শ্যামাকে। বুদ্বুদের মতো সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল আমার। ভাবতে ঘৃণা লাগছিল– অন্যের সন্তান আমার স্ত্রীর গর্ভে? আবার ভাবলাম– আমিই তো বলেছি? ও তো রাজিই হয় নি? তবে? কিন্তু, তারপরও মনটাকে বুঝাতে পারি নি। মন বলে– আমি না হয় বলেছি, তাই বলে সে করেই ফেলবে? মেনে নিতে বেশ কষ্ট হয়েছিল আমার।

দিন যায় এমনি করে। মনের দূরত্ব বাড়তে থাকে আমাদের। কী এক অসহ্য যন্ত্রণা সারাক্ষণ বিদ্ধ করে আমাকে। মাথার ভেতর লক্ষ কোটি ধারাল সূক্ষ্ম সুচের সরু সুচাল উত্তপ্ত মাথার ছোটাছুটি। প্রায় উন্মাদ করে তোলে। বন্ধু মুনিমকে আমি সহ্য করতে পারতাম না। বন্ধুর অভিনয় করে যেতাম। ভেতরে এক তীব্র ঘৃণা কাজ করে। যখনই হাসি-তামাশা করত ওরা, আমার গা জ্বলে যেত। সহ্য হত না। এ কী দুঃসহ জীবন-যাপন! কয়েক মাস যেতে শ্যামার তলপেট স্ফীত হয়ে উঠল। যখনই ওর দিকে তাকাতাম, আমার চোখ পড়ত ওখানে। আর তখনই কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠত। মনে হতো ওখানে শুয়ে আছে এক অন্য পুরুষের সন্তান। আমার স্ত্রীর গর্ভে বেড়ে উঠছে এক প্রতারকের বাচ্চা। আমি জাত-পাত মানতাম না। এখনও মানি না। কিন্তু পরিস্থিতি এমন হলো যে, কোনোভাবেই আর মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই খুঁজে খুঁজে স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতাম। উদর যত স্ফীত হয় স্ত্রীর, ঘৃণাও তত স্ফীত হয় আমার। না, আর ঢলাঢলি নয়। বাসায় ছিল না শ্যামা সেদিন। একদিন মুনিম এল। ততদিনে ওর পিএইচ.ডি. গবেষণা শেষ। বসল। কোনো কারণে আগে থেকেই বিষণ্ন ছিল মনটা। মুনিম এসেই বলল– শ্যামা কই, ওকে দেখছি না যে? আমার মাথায় শয়তান ভর করল। বললাম– কেন, শ্যামাকে এত কীসের প্রয়োজন তোমার? দেখো মুনিম, শ্যামার সাথে তোমার এতটা ঢলাঢলি আমি পছন্দ করি না।

মুনিম– মিহির, তুমি কী বলছ?

মিহির– যা বলছি ঠিকই বলছি। প্রয়োজন ছিল মেশার, মিশেছ। এখন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এবার মুক্তি দাও।

মুনিম– প্রয়োজন, কীসের প্রয়োজন? আমি তোমাদের কাছে আসি বন্ধুত্বের টানে।

মিহির– বন্ধুত্বের টানে? এখন আর কিচ্ছু জান না তুমি? ধোয়া তুলসীর পাতা? বন্ধুত্বের টানে না কীসের টানে, আমি তা ভালো করেই জানি?

মুনিম– মিহির, তুমি বন্ধুত্বের সীমা লঙ্ঘন করছ।

মিহির– বন্ধুত্ব, কীসের বন্ধুত্ব? এই তোমার বন্ধুত্ব? বিশ্বাসের মূল্য দিয়েছ আমাকে। বন্ধুত্বের সুযোগে তুমি আমার চরম সর্বনাশ করে ছেড়েছ। আমি কিচ্ছু বুঝি না, তাই না? রাতদিন শ্যামার সাথে কীসের এত ঢলাঢলি?

মুনিম থ' হয়ে যায়। কোনো কথা বলে না কিছুক্ষণ। কী যেন ভাবে। শেষে উঠে দাঁড়ায়। আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে বলে–

– দুঃখিত মিহির, আমি জানতাম না; আমাকে নিয়ে এত সব। যদি বুঝতে পারতাম কখনও, তাহলে আসতাম না তোমাদের বাসায়। মিশতাম না কখনও। তোমাকে বলে যাই– বন্ধুত্বের টানেই আসতাম। কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না আমার মনে। নেইও। শ্যামার সাথে আমার সম্পর্কের যে ইঙ্গিত করেছ, তা মিথ্যে। তুমি আমাকে ভুল বোঝ, শ্যামাকে ভুল বুঝো না। মিথ্যে ভুল বুঝে সংসারে অশান্তি এনো না। মিথ্যে ভুল বোঝার কারণেই সংসার ভাঙে। মন ভাঙে। সামান্য সন্দেহে মানুষ বড় ভুল করে ফেলে। বিরাট-ভয়ঙ্কর অশান্তি টেনে আনে। অবশ্য ভুল সে একদিন বুঝতে পারে। তখন বড় দেরি হয়ে যায়। শোধরাবার আর সময় থাকে না। পথ থাকে না। শুধু বিশ্বাস কর, শ্যামার সাথে আমার কোনো অবৈধ সম্পর্ক ছিল না। নেই। আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এই তোমার বন্ধুত্ব? সামান্য সন্দেহে এত বড় অবিশ্বাস করতে পারলে আমাকে? দোষ দেব না তোমাকে। কারণ, তুমিও তো মানুষ? মানুষ এ সবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। তাই আমি এই সংসার সংসার খেলা থেকে দূরে থাকতে চাই সব সময়। কিন্তু, দূরে থেকেও তো দুর্নাম ঠেকাতে পারলাম না।

মিহির– অত ভণিতার প্রয়োজন নেই তোমার, শুধু একটা অনুরোধ করব– আর কোনোদিন তুমি এখানে এসো না। শ্যামার সাথে কোনো যোগাযোগ রেখো না। বন্ধুত্বের প্রতিদান তো দিয়েছ? আর একটা ছোট্ট অনুরোধ করব– একথা কোনোদিন কারও কাছে প্রকাশ করো না।

মুনিম– এখনও তোমার ভুল ভাঙল না? হায়রে মানুষ! নিজের বিশ্বাসকেই সে শ্রেষ্ঠ মনে করে! সত্যও ধামাচাপা পড়ে যায় নিজের বিশ্বাসের কাছে। ভুল ভাঙে একদিন, কিন্তু ভাঙা মন আর জোড়া লাগে না তখন। থাকো তুমি তোমার বিশ্বাস নিয়ে। তবে প্রকৃত সত্য একদিন তুমি জানবেই। সত্য কখনও অপ্রকাশিত থাকে না। পাপও কখনও গোপন থাকে না। তবে আর একবার আসব তোমার সাথে দেখা করতে। বহু বহুদিন পর। শুধু জানতে আসব– তখনও আমার প্রতি তোমার এই ধারণা থাকে কিনা।

মিহির– তার আর প্রয়োজন নেই। আমার সর্বনাশ করতে এসো না।

এরপর চলে গেল মুনিম। আর আসে নি। এই কিছুদিন আগে একবার এসেছিল। আমার চাকরি থেকে অবসর নেবার কিছুকাল পরেই। অবশ্য চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর আমি সপরিবারে কলকাতায় চলে আসি। সেই যে আমার সাথে ঝগড়া করে চলে গেল সরাসরি বিদেশে। দেশেও আর ফেরে নি। বিয়েও সম্ভবত করে নি। সে কথা পরে বলছি। তারপর দিন যায়, আবার মনের দূরত্ব বাড়তে থাকে শ্যামার সাথে। সেদিন সন্ধ্যায় মুনিম চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে শ্যামা ফিরে এল। এসেই বলল– মুনিম এসছিল বাসায়? আমার রিক্সাটা ক্রস করে কাটিয়ে গেল। ডাক দিলাম। তাকাতেই চোখে চোখ পড়ামাত্রই চোখ নামিয়ে নিল। কিছু বলল না। না চেনার ভান করে চলে গেল। এর অর্থ কী?

আমি বললাম– আমি কী করে বলব, এর অর্থ কী?

এর কয়েকদিন পরেও যখন মুনিম এল না– একদিন তার আস্তানায় গিয়ে হানা দিল শ্যামা। এসে বলে– বলো তো, কেমন লোক তোমার বন্ধু? সে গতকালকের ফ্লাইটে কানাডা চলে গেছে। একটু বলে যাবার প্রয়োজনীয়তাও কি মনে করল না? এই হয়। বিদেশে গেলে কিংবা বড়লোক হয়ে গেলে কেউ, বন্ধুত্বে ভাটা পড়ে। তখন বাল্যবন্ধু বিলেই হারিয়ে যায়।

আমি কোনো কথা বললাম না। শুধু শুনে গেলাম। গরগর করে অনেকক্ষণ রাগ ঝাড়ল শ্যামা। মন খারাপ করেও থাকল কয়েকদিন। আমি কিছুই বললাম না।

ক্রমে ঘনিয়ে এল সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর দিন। কষ্ট আর আনন্দের দিন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। কী ভয়ঙ্কর জীবন যাপন। শ্যামাকে একটুও সহ্য করতে পারতাম না। অথচ প্রকাশ করতাম না তা কখনও। সহজভাবে মিশতে চেষ্টা করতাম। কারণ, আমিই ওকে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম ওই ঘৃণ্য কাজে। ফলে আত্মদংশনটা ছিল আরও তীব্র। বাইরের লোকেরা জানত, আমরা সুখী। সুখী দম্পতির অভিনয় করতাম। ভেতরে কষ্ট লুকিয়ে ঠোঁটে হাসি ফোটাতাম। আমার মনে হয় প্রতিটি দম্পতিই এরকম অভিনয় করে যায় জীবন ভর, সম্মান বাঁচাতে। অথচ প্রত্যেকেই এরা সুখী হতে পারে। সামান্য কারণে বিরাট ক্ষতি ডেকে আনে। আমিও অভিনয় করে যেতাম আমার স্ত্রীর সাথে– সমাজের সাথে– সংসারের সাথে।

ভেতরে ছিল এক গনগনে ক্ষত। ভেতরে অগ্ন্যুদ্গার, অথচ বাইরে কী সবুজ-শীতল পৃথিবী। অবশেষে এল সেই অভিশপ্ত কাঙ্ক্ষিত দিন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। সন্ধেয় উঠল প্রসব বেদনা। নিয়ে গেলাম নার্সিং হোমে। মনে মনে কামনা করতে লাগলাম প্রতিমুহূর্তে– এ সন্তান যেন না বাঁচে। ভাবো তো বাবা, আমি একজন অধ্যাপক, বিবেকবান মানুষ, অথচ কত জঘন্য এক কামনা পোষণ করেছিলাম মনে! এ সকল বিষয়ে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তখন পশু হয়ে যায়। এখানেই পশুর সাথে মানুষের মিল। আন্তরিকভাবে কামনা করতে লাগলাম, ওই সন্তান

নষ্ট হয়ে যাক। মরে যাক। তাহলে সারাজীবন মিথ্যে পরিচয় বহন করে থাকতে হবে না। কিন্তু চাইলেই কি চাওয়া হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয়?

রাত বারোটা। মিহি বাতাস ভেসে আসে দূর থেকে। হাল্কা কুয়াশায় জ্যোৎস্না মিশে এমন সুন্দর লাগছে; অথচ সুন্দর লাগছে না। মাথার ঠিক উপরে রুপোর টাকার মতো চাঁদ। কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ। রাকা। এই সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে মিশেছে মফস্বল হাসপাতালের কোনো প্রসূতির চিৎকার। একবার ভাবলাম– শ্যামাসহ মারা যাক এ নবজাতক। কিন্তু তা ভাবতে পারলাম না। শ্যামাকে যে আসলে প্রচণ্ড ভালোবাসি। ভালোবেসেই বিয়ে করেছি। সেও আমাকে ভালোবাসে। তাছাড়া সে তো নির্দোষ। সে তো আমাকে ঠকাতে চায় নি, ঠকায় নি? বিশ্বাসভঙ্গের কিছু করে নি? তবে কেন তাকে ঘৃণা করব? কোথাও শিউলি ফুটেছে। গন্ধ ছুটেছে। বাতাস গন্ধময়। আবোল-তাবোল ভাবছিলাম। এমন সময় বাতাস চিরে সদ্যজাতর চিৎকার। হঠাৎ সমস্ত চিন্তার জাল গেল ছিঁড়ে। দুশ্চিন্তা উড়ে গেল সব। মনে হলো ওই নবজাতক তো নিষ্পাপ! ওর তো কোনো দোষ নেই। ওর তো কোনো হাত নেই ওর জন্মে? অন্যের পাপে ও কেন পাপী হবে? ও কেনো ফল ভোগ করবে অন্যের পাপের? ওই নিষ্পাপ শিশুর আছে ভালোভাবে বাঁচার অধিকার এই পৃথিবীতে। ও আমারই সন্তান।

কোনো শিশুর জন্মে কোনো পাপ নেই। জারজ বলে কিছু নেই। প্রত্যেক শিশুরই পিতা থাকে। হোক সে সমাজস্বীকৃত কিংবা সমাজ অস্বীকৃত। জানা অথবা অজানা। তবু পিতা থাকেই। অতএব, এই শিশুর আছে বাঁচার অধিকার। সে পাপী নয়, নির্দোষ।

কিছুক্ষণ মৌন থাকেন মিহিরবাবু। সূর্য জল ছুঁই ছুঁই করছে। এখনই ডুবে যাবে। গলে যাবে জলে। দু'জন দু'টো পাথরের উপর বসে থাকেন দু'জন পাথর হয়ে। চোখে বর্তমান অনুপস্থিত। জাগ্রত বাইশ বছর আগের স্মৃতি। কোনো দিক তাকিয়ে থাকলেই চোখের সামনের ঘটনা দেখা যায় না। বরং যা নেই সেখানে তা-ও যায় দেখা। তাই স্মৃতি আর স্মৃতিকথা শোনায় বিভোর দু'জন। সন্ধের আবছায়া লুফে নিল আলো। আবার শুরু করলেন মিহিরবাবু–

কী এক মোহ টানছিল আমাকে। মনে হচ্ছিল আমিই পিতা ওই শিশুর। ছুটে গেলাম ভেতরে। আসলে পিতৃত্ব এমন এক অনুভব তা বোঝাতে পারব না। ইচ্ছে হচ্ছিল কোলে তুলে নিই। আদর করি। নার্সরা ঢুকতে দিল না। কিন্তু এক পলক না দেখতে পারলে আর নয়। মুনিমের সন্তান ও, তা মনেই হয় নি একবারও। আসলে জীবনটাই ভুলে ভরা। নাকি ভুলে গড়া? আমার সেই না ভাবা ভাবনাও যে ভুল ছিল তা কি জানতাম তখনও? একটু পরেই এক নার্স এসে বলল– মিষ্টি আনুন, মেয়ে হয়েছে। মা-মেয়ে দু'জনই সুস্থ। আসলে প্রচণ্ড খুশি লাগছিল আমার। মেয়ে সন্তানই আমার কাম্য ছিল প্রথম। দু'টো সন্তানের মধ্যে প্রথমটি মেয়ে হলে সংসারটা মনে হয় ফুলের বাগান হয়ে যায়। কিন্তু আমার যে ওই একটিই সন্তান হবে? আর তো কোনো সম্ভাবনা নেই হবার? ভেতরে গেলাম। বললাম– কই, আমার মেয়ে কই? খুশি হলো শ্যামা। হাসল মৃদু। অমন সুন্দর প্রাণবন্ত হাসি দীর্ঘদিন দেখা হয় নি। মন ভরে গেল। এতদিনের জমানো সব যন্ত্রণা যেন কোনো অদৃশ্য রবার দিয়ে কেউ মুছে দিল। আমি আর শ্যামা যেন সেই প্রথম জীবনে ফিরে গেলাম। প্রথম প্রণয়ের কাছে।

এরপর বাইশটা বছর কেটে গেল সুখে দুঃখে। মাঝে মধ্যে যে ওই গোপন কষ্টটা আমাকে যন্ত্রণা দিত না এমন নয়। তবে বুঝতে দিতাম না কাউকে। রাকা কখনও জানে নি ওর জন্মের রহস্য। আমিও কি কম অভিনেতা? সারাজীবন সবার সাথে থেকে একটুও বুঝতে দিই নি আমার কষ্ট। কাউকে বলি নি কষ্টের কথা। সবার মধ্যে থেকেও সারাজীবন কেমন নিঃসঙ্গ ছিলাম। আজও আমি নিঃসঙ্গই। আসলে প্রতিটি মানুষই রহস্যময়। রহস্যের আবরণে ঢেকে রাখে জীবন। বুঝতে দেয় না অন্যকে তার আসলত্ব। আমরা মানুষকে যা চিনি, তা তার খোলসমাত্র। প্রতিটি মানুষই দু'জন থাকে। একজন ভেতর। অন্যজন বাহির। একজন বাস্তব। আর একজন অভিনেতা। বড় কঠিন কাউকে জানা। চেনা যায় না এই রহস্যময় মানুষ। আমাকেও কি একটুও চিনতে পেরেছি আমি? এ যাবৎ শুধুই অভিনয় করে গেছি।

তবে রাকাকে কখনও ঘৃণা করি নি। কষ্ট দিই নি। এখনও দিই না। দেব না কোনোদিন। ওকে কখনও জানতে দেব না ওর জন্মের রহস্য। আমি গভীর মমতায় শ্যামার হাত ধরলাম। বললাম কষ্ট হলেও সামান্য সময়ের জন্য চলো বাইরে।

নার্সের সামান্য নিষেধ সত্ত্বেও এলাম। চাঁদটা একটু হেলেছে তখন, পশ্চিমে। বললাম– কী চমৎকার চাঁদ, তাই না! আবার আমরা ফিরে গেলাম প্রথম প্রণয়ের মুহূর্তে। জ্যোৎস্না ধুয়ে দিয়ে গেছে আমাদের মনের মলিনতা। আজ কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। আকাশের ওই চাঁদকে কী বলে? শ্যামা বলল– 'রাকা'। বললাম– আজ এই দিনে আমাদের একমাত্র সন্তান এল আমাদের কোলে, সেতুবন্ধ হয়ে। পূর্ণিমার আলো হয়ে। ওর নাম হোক রাকা? শ্যামা বলল– বাঃ বেশ, সুন্দর নাম তো? সেই থেকে রাকা আমার হৃদয় আকাশে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র হয়ে সবসময় ফুটে থাকে।

তুহিন– রাকা তাহলে আপনার মেয়ে নয়?
মিহিরবাবু– আমি জন্মদাতা নই।
তুহিন– মুনিম সাহেবই কি তাহলে ওর জন্মদাতা?
মিহিরবাবু– তাই তো জানতাম। কিন্তু সে জানাও আজ প্রহেলিকায় ঢাকা। আসলে সমস্ত জানাগুলোই কখন যেন কেমন অজানা হয়ে যায়। তাই তো বলি– যে সত্য প্রতিমুহূর্তে জানি, সে সত্য পাল্টে যায় প্রতিমুহূর্তে। দেখা দেয় নতুন জটিলতা। নতুন সত্য।
তুহিন– সে আবার কী?
মিহিরবাবু– সে আর এক নির্মম সত্য। ভয়ঙ্কর। তা-ও সত্য কিনা কে জানে? নাকি তারও অন্তরালে রয়েছে আরও কোনো নতুন সত্য? জানি না এখনও। সময়ে সব উন্মোচিত হয়।
তুহিন নির্বাক বসে থাকে আরেক পাথর। অন্য পাথর কথা বলে– চাকরি থেকে অবসর নিলাম বছরখানেক। কয়েক মাস আগে হঠাৎ একদিন বিদেশ থেকে মুনিম এসে হাজির। এতদিন ভুলেই ছিলাম ওর কথা। সেই কষ্ট করা কষ্টের কথা। হঠাৎ যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সমস্ত বোধ। নিষেধ করেছিলাম আর কখনও আসতে ওকে। এল। বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করল বন্ধু। হাসিমুখে দু'টো কথাও বললাম না। আগুন জ্বলে উঠল মাথায়। বললাম– বেইমান, কেন এসেছ? কী সত্য প্রকাশ করতে এসেছ আবার? সন্তানের দাবি নিয়ে এসেছ? আসলে মাথায় রাগ চাপলে আমার রক্তে তোলপাড় খেলে। আমি তখন উন্মাদ হয়ে পড়ি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি নিজের। আমি আর আমি থাকি না। কী যে বলি, কী যে করি, তার ঠিক থাকে না। তাছাড়া বন্ধু যদি শত্রু হয়, সে হয় সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রবল ভালোবাসা থেকেই সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড ঘৃণার, যদি ভালোবাসায় ফাটল ধরে। মুনিম বলল– বলেছিলাম আসব। এসেছি। সত্য যা তাই বলতে এসেছি।
মিহিরবাবু– রাকা তোমার সন্তান, এই তো?
আকাশ থেকে পড়ল মুনিম– বলছ কী মিহির? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ভাবলে কী করে...
মিহিরবাবু– মিথ্যেবাদীরা এমন ভাবে কথা বলে যেন সত্য মনে হয়। একটা মিথ্যে দিয়ে আর একটা মিথ্যেকে ঢাকে।
মুনিম– মিহির কী বলতে চাও তুমি?
মিহিরবাবু– বলতে চাই, জন্মদাতা হলেই বাবা হওয়া যায় না। সন্তানের দাবি নিয়ে তুমি রাকার সামনে আসবে না কখনও। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।
মুনিম– আমিও তোমাকে ঘৃণা করি। ছিঃ ছিঃ নিজের স্ত্রীকে তুমি এতটা নীচ ভাবলে? আমাকে নীচ ভাবলে? কুৎসিত তোমার ভাবনা। মিথ্যে তোমার শিক্ষা।
মিহিরবাবু– আর ভণিতার প্রয়োজন নেই। এবারে যেতে পার তুমি। আর কখনও এমুখো হয়ো না।
মুনিম– যাব। এখানে থাকতে আসি নি আমি। শুধু ভুল ভাঙাতে এসেছিলাম তোমার। ভেবেছিলাম এতদিনে ভুল বুঝতে পেরেছ তুমি? তা এক সত্য শোনাতে এসে শুনলাম আরও ভয়ঙ্কর মিথ্যে। শোন, তোমার সন্তানের বাবা আমি নই। আর শ্যামার সাথে আমার কোনো অবৈধ সম্পর্ক কোনোদিন ছিলও না। এতদূর থেকে এই পড়ন্ত বয়সে এ সত্য জানাতেই এসছিলাম আমি। এটাই সত্য। এবারে তোমার মতো করে ভাবতে পার তুমি। হায় নির্বোধ মানুষ, সাহিত্যের অধ্যাপক, সন্দেহই নিঃশেষ করে দেবে তোমাকে। সামান্য ভুল বোঝাই ধ্বংস করে দেবে তোমার জীবন। মিথ্যে তোমার শিক্ষা। মিথ্যে তোমার সাহিত্য পড়া। চলি।
চলে গেল মুনিম। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল মাথায়। বসে পড়লাম সোফায়। ভাগ্যিস রাকা ছিল না বাড়ি। তার এক বান্ধবীর জন্মদিনে দুপুরেই গেছিল চলে। ফিরতে রাত। কিন্তু আশ্চর্য, শ্যামা ঘরেই ছিল। একবারও ড্রইং রুমে এল না। সম্ভবতঃ পরিস্থিতি জটিল দেখেই বেরোয় নি। মুনিম আসার সাথে সাথেই ঝগড়া। তাই সুযোগ পায় নি আসার।
অনেকক্ষণ বসে থাকলাম একইভাবে পাথর হয়ে। এ আবার কোন সত্য শোনাল মুনিম? তাহলে কি রাকা মুনিমের ঔরসজাত নয়? কে তবে রাকার পিতা? মনে হচ্ছিল– এর চেয়ে মুনিমই ভালো ছিল; বন্ধু মানুষ, ভালো মানুষ। মুনিমের প্রতি একটা শ্রদ্ধা এল। মনে হলো বড় অন্যায় আচরণ করে ফেলেছি মুনিমের উপর। এও আর এক কষ্ট। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে যাই। খুঁজে বের করি মুনিমকে। ক্ষমা চেয়ে নিই। ভাবো তো– একটু আগে যাকে এত জঘন্য মনে করেছি, একটু পরেই তাকে প্রচণ্ড ভালো মনে করছি। তখন মনে হচ্ছিল মুনিম রাকার বাবা হলেই ভালো হতো। এ আর এক যন্ত্রণা। হায় মানুষ। একটু আগে যাকে ভালো ভাবি, একটু পরে সামান্য ভুলেই তাকে জঘন্য ভাবি। অথচ সেই মানুষটি থাকে সেই একই মানুষ। আমাদের ভাবনায় সে হয়ে পড়ে খারাপ বা ভালো। বিচিত্র এই মানুষ। বিচিত্র মানুষের মন। সংসারটাই বুঝি এ রকম। হঠাৎ মনে হলো মুনিম যে সত্য বলেছে তার নিশ্চয়তা কী? নিজের দোষ কি কেউ কখনও স্বীকার করে? হয়ত দোষ এড়াতেই বড় বুলি আউড়ে গেল। আবার একটু একটু ঘৃণাবোধ জেগে উঠল মুনিমের প্রতি।

মন হলো ঘড়ির পেন্ডুলাম। দোলে সে সন্দেহের দ্বন্দ্ব-দোলায়। তবুও কেন যেন মনে হতে লাগল রাকা কি তাহলে মুনিমের সন্তান নয়? কোনো কিছু জানায় আছে পরম নিশ্চিন্তি– হোক সে সত্য কিংবা মিথ্যে; পাপ কিংবা পুণ্য। কিন্তু যখন এই জানাটাই সংশয়ে দোলে, সে আর এক তীব্র যন্ত্রণা। জানা পাপের চেয়ে অজানা পাপ সম্বন্ধে সংশয় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার। তা-ই আমাকে তখন বিদ্ধ করছে প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু আশ্চর্য, আমিও দেখা করলাম না শ্যামার সাথে। শ্যামাও দেখা করল না সে রাতে। শরীর খারাপের অজুহাতে শুয়ে থাকল। আমি বুঝতে পারলাম বিষয়টি। ও শুনে ফেলেছে সব। আমিও তাই লজ্জা পাচ্ছিলাম। পাচ্ছিলাম কষ্ট। Life is a comedy to those that think but a tragedy to those that feel. জীবনটা যন্ত্রণার একতাল মাংস পিণ্ড, ক্রমাগত যে আরও যন্ত্রণার দিকেই ধায়। কান্না আসে। কাঁদতে পারি না–

So sweet was ne'er so fatal
I must weep
But thay are cruel tears.

গভীর রাতে রাকা ফিরল। খেয়েই ফিরছিল বলে ঝামেলা হলো না। তাই বুঝতে পারল না পরিস্থিতি। পরদিন নিত্যদিনের মতোই সকাল হয়। স্বাভাবিকভাবেই শ্যামা আচরণ করে। আমি চেষ্টা করি স্বাভাবিক থাকতে। এমন করেই শুরু দিনটির। তখনও পারি নি বুঝতে এ ছিল ঝড়ের পূর্বাভাস। ঝড়ের আগে যেমন শান্ত হয়ে আসে প্রকৃতি, পৃথিবী হয় স্থির, তেমনি। ভয়ঙ্কর কিছুর প্রস্তুতি বুঝি এমন নিঃশব্দেই নিষ্পন্ন হয়? বিকেলে চায়ের টেবিলে শ্যামা বলল– রাকা, কাল ভোরে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি কোথাও। চিন্তা করো না।
রাকা– কোথায় মা?
শ্যামা– কোনো কিছুরই সবটা শুনতে চেয়ো না।
কপট রাগ দেখিয়ে চুপ মেরে গেল রাকা। আমি কিছু বললাম না। বুঝতে পারছিলাম একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আবার ভাবছিলাম– মন খারাপ বলে কিছুদিনের জন্য হয়ত ঘুরে আসবে কোথাও। কিন্তু সংশয় কাটে নি। কোনো প্রশ্নও পারছিলাম না জিজ্ঞেস করতে। নিঃশব্দে ঘটে গেল এসব। পরদিন ভোরে আর দেখা গেল না শ্যামাকে। ঘুম ভাঙার আগেই চলে গেল। মনটা হঠাৎ কু গাইতে লাগল। বিষণ্ন হয়ে গেল সকাল। এভাবে চলে গেল কেন? এ কোন্ ইঙ্গিত? কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেল দিন।
সন্ধে উৎরে গেছে। আগে থেকেই উঠে ছিল দশমীর চাঁদ। আকাশে। ঢেউয়ের মাথায় জ্বলছিল ফসফরাস। অন্ধকারের মাঝে স্বর্গীয় আলো। নীলাভ সে আলো জ্বলেই নিভে যায় মুহূর্তে। কী এক রহস্য তাতে। সে সবই যেন উপহাস করছিল জীবনকে। তুহিন বলল– তারপর?
দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টেনে এবং ছেড়ে দিয়ে মিহিরবাবু বললেন– আমার বুঝতে অসুবিধে হয় নি– ও চলে গেছে। আর ফিরবে না। যে যায় সে দীর্ঘ যায়। সময় যেমন নিঃশব্দে যায়, কখন যায় বোঝা যায় না। অথচ চলে যায়। তেমনি সেও গেছে চলে। অনন্ত শূন্যতা আচ্ছন্ন করল আমাকে। যতই ঘৃণা হোক না কেন তার প্রতি, চলে গেলে প্রবল কষ্ট লাগছিল। কিন্তু, যখনই মনে হচ্ছিল এমনও তো হতে পারে, মুনিমের সাথেই চলে গেছে সে। তখনই আবার এক ঘৃণা জাগত শ্যামার প্রতি। সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে এক সময় মনে হলো, সত্যিই সে চলে গেছে মুনিমের সাথে। এ বিশ্বাসই দৃঢ় হলো। আর মনে হলো মুনিমের সব কথাই বানানো। প্রচণ্ড এক ঘৃণা পুষে চললাম মনে মনে। ঘৃণা এমন এক কাঁটাবৃক্ষ, যা বাড়তে দিলে বাড়তেই থাকে। তখন মনে হচ্ছিল– মুনিমের আসা, শ্যামার চলে যাওয়া, সব পরিকল্পিত। তবুও বিষয়টি Conform হবার জন্য বিমান অফিসে যোগাযোগ করলাম। কী আশ্চর্য মিল। শ্যামাও কানাডা চলে গেছে। একই Flight এ। এত বছর একই সাথে সংসার করার পর, ভালোবেসে বিয়ে করার পর, এই প্রৌঢ় বয়সে যদি কারও স্ত্রী চলে যায় অন্যের সাথে, সেটা কত যন্ত্রণার, তা যার হয়, সে-ই বোঝে।
শ্যামা আমাকে ভালোবেসেছে। বিয়ে করেছে। কিন্তু পিতৃত্বহীন এক পুরুষের সাহচর্য তাকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে বলে সে তাকে ত্যাগ করেছে। এ কি দোষের? এ কি দোষের নয়? আমি অক্ষম এক পুরুষ। না। অক্ষম নয়। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম এক পুরুষ কী করে পেতে চাই মাতৃত্বপিপাসিনীর সাহচর্য? তাই সে অন্যের সন্তান গর্ভে ধরেছে। সন্তান জন্ম দিয়েছে। মা হয়েছে। তারই দৌলতে আমি হয়েছি বাবা। কষ্ট হলেও এ যাবৎ মেনে নিয়েছি। কিন্তু সেই পুরুষকে ভালোবাসবে, তা কি মেনে নেয়া যায়? পারে মেনে নিতে কোনো পুরুষ? স্বামী বা স্ত্রী সব পারে সহ্য করতে। পারে না শুধু স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো জন অন্য নারী বা পুরুষে আসক্ত হলে। সেখানে বন্ধুত্ব শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'র মতো। আমিও পারি নি মেনে নিতে। পারা যায় না। তবুও মেনে নেয়ার ভান করেছি। অভিনয় করেছি। অবশেষে সে অভিনয় ব্যর্থ করে দিয়ে, সমস্ত প্রেম, সকল ভালোবাসা পায়ে দলে, ছাব্বিশ বছরের দাম্পত্য ভেঙে দিয়ে চলে গেল, আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে। এ কি কল্পনাও করা যায়?

তুহিন– আশ্চর্য! এত বছর পর, এই বার্ধক্যে পারল যেতে? এমনও হয়?
মিহিরবাবু– আশ্চর্য হচ্ছো? এখানেই শেষ নয় এ কাহিনির। আশ্চর্য হবার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় থাকে পৃথিবীতে। আমি জানতাম সে মুনিমের সাথে চলে গেছে। রাকা মুনিমের সন্তান। কিন্তু, সব জানার অন্তরালেও অন্য অজানা থাকে। থেকে যায়। হয়ত তা-ই সত্য। হয়ত তাও সত্য নয়। কারণ, কোনো মা-ই ঠিকভাবে বলতে পারে তা-ও সব সময় নয়, যে তার গর্ভের সন্তানের বাবা কে? সেই সত্য বলে গেল শ্যামা।
তুহিন– কী বলছেন? রাকা মুনিমের মেয়ে নয়?
মিহিরবাবু– না। হয়ত, না। শ্যামার ভাষ্য। সে বলেছে– রাকা মুনিমের মেয়ে নয় এবং মুনিমের সাথে তার কোনো অবৈধ সম্পর্কও ছিল না।
তুহিন– সে কী?
মিহিরবাবু– আমি বুঝতে পারছি না, কোনটা সত্য। শ্যামার কথা? না কি আমার সন্দেহ?
তুহিন– How strange?
মিহিরবাবু– বলেছি, জগতে সকল জানার অন্তরালেই এক অজানা লুকিয়ে– যা জানা যায় না কখনও। শ্যামা চলে যাবার পর মাঝে মাঝেই রাকা জিজ্ঞেস করত ওর মায়ের কথা। কতদিন আর ভুলিয়ে রাখব? একদিন আদর করে বললাম– সে আর আসবে না মা। চলে গেছে আমাদের ছেড়ে। জানতে চেও না, কোথায় গেছে। সব জানতে নেই। যে জানায় কষ্ট বাড়ে, তা না জানাই ভালো। শুধু জানো, তোমার বাবাকে নিয়ে সে সুখী হতে পারে নি। এরপর গম্ভীর হয়ে থাকত রাকা। তবে আমার প্রতি খুব খেয়াল নিত। আর কোনো প্রশ্ন করে নি সে কোনোদিন। এই কিছুদিন আগে মাত্র জানলাম আর এক চরম সত্য। কে জানে তা-ও সত্য কিনা? রাকা অবশ্য জানে না এখনও? আমার লেখার ড্রয়ারের তলে, লেখা কাগজের ভেতর একটা চিঠি। শ্যামার চিঠি। ভয়ঙ্কর এক সত্য ঘোষণা করল সে। জগতে এমন এমন কিছু সত্য থাকে যা কল্পনাতীত। এমন কিছু কিছু সত্য গোপন থাকাই ভালো। এমন সত্য প্রকাশিত না হওয়াই ভালো। কিছু কিছু অজানা না জানাই ভালো। যে সত্য উন্মোচিত হলে চরম বিপর্যয় ঘটে সে সত্য মিথ্যে হয়ে থাকাই ভালো। সব সত্য জানতে নেই। ইডিপাসের কথা ভাবো– যদি সে সত্য জানতে না চাইত, যদি সে না জানতে চাইত তার পরিচয়, অতবড় সর্বনাশ হতো না। আত্ম অনুসন্ধান অনেক সময় মারাত্মক বিপর্যয় ঘটায়। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। শ্যামার সেই শেষ চিঠি আর এক চরম সত্যের মারাত্মক ধাঁধা। চিঠির ভাষাটা এরকম–
'জানি না বিশ্বাস করবে কি না আমার কথা, তবুও বলছি– যা সত্য, তাই বলছি। বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্পূর্ণ তোমার উপর। আজ আমি চলে যাচ্ছি। কোথায়, তা জানার প্রয়োজন নেই। শুধু জানো চলে যাচ্ছি এবং ফিরছি না আর। এ চিঠি হয়ত এখনই পাবে না। বহুদিন পরে পাবে। তখন পারবে জানতে সব সত্য। রাকা মুনিমের সন্তান নয়। আর মুনিমের সাথে আমার কোনো অবৈধ সম্পর্ক কোনোকালে ছিলও না। নেই-ও। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম তোমাকে। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কখনও ভাবি নি, ভাবতে পারি নি। অথচ সন্দেহ আনলে ভালোবাসায়। সেটাই আমার সবচেয়ে বড় কষ্টের। চেষ্টা করছিলাম মেনে নিতে। পারলাম না শেষ রক্ষা করতে। যখন দেখলাম, আমার কারণে তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আজন্ম সত্যসেবী একজন ভালোমানুষ, ঘৃণিত হয়ে উঠছে তোমার চোখে।
আমাকে দোষ দিতে পারো। কারণ, তুমি পিতা হবার ক্ষমতা রাখো না। অথচ আমি মা হয়েছি। কিন্তু সে কীসের জন্য? তোমার জন্য। তোমার কষ্ট দূর করার জন্য। তোমার পীড়াপীড়ির জন্য। অথচ সেই তুমিই কিনা ঘৃণা করলে আমাকে? তুমিই মুনিমকে ভুলিয়ে শয্যাসঙ্গী করতে বলেছিলে আমাকে। পারি নি। ওই নিষ্পাপ সরল হাসিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে এ পাপে টেনে আনতে পারি নি আমি। বিবেক বাধা দিয়েছে। আবার তোমারও মন রক্ষা করতে হবে। তাই অন্য পথ বেছে নিলাম। তুমি কষ্ট পাবে বলেই গোপন করে গেলাম বিষয়টি। সেটাই হয়ত আমার এক মস্ত বড় ভুল। বললে হয়ত মুনিমকে ভুল বুঝতে না তুমি। আর হতো না এত বড় ক্ষতি। আমার ভালোবাসায় সন্দেহ পোষণ করছ। সে বড় কষ্টের। তার চেয়ে বড় কষ্টের আমার কারণে একজন ভদ্রলোকের চরিত্রে তুমি কলঙ্কের কালি মাখাতে চাইছ। অবশ্য এত বছর পরে তা তোমাকে বললে বিশ্বাসও করতে চাইবে না। তাই বলি নি। আমি একজন খুনি। আমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তার আগে ফাঁসি হওয়া উচিত তোমার। কারণ, পরোক্ষভাবে তুমিই দায়ী। আর তাই এত বছর পর নিজ দেশ ছেড়ে চলে গেলাম দূরদেশে। এ সব কথা রাকাকে জানতে দিও না কোনোদিন। এখনও তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু, আর সম্ভব ছিল না এ সত্য প্রকাশের পর একই সাথে থাকা। তাই চলছি।
আমি একজন খুনি। আমার পাপ গোপন করার জন্যই আমি খুনি। কিন্তু, এখন বুঝলাম কোনো পাপই কোনোদিন গোপন থাকে না। কোনো না কোনোভাবে একদিন সে প্রকাশিত হয়ই। ভাবি নি এ পাপ প্রকাশিত হবে কোনোদিন। অথচ বাধ্য হয়েই করছি। না করলে বড় বেশি কষ্ট পাচ্ছি। পাপ সব সময় উন্মুখ থাকে প্রকাশের জন্য। কোনো গোপনই গোপন থাকে না কোনোদিন। কোথাও না কোথাও রেখে যায় কোনো চিহ্ন।

মনে আছে, তোমার আলমারি থেকে এক বোতল হুইস্কি হারানো গেছিল? তাই খেয়ে মারা গেল সাঁওতাল পাড়ার যুবক হাঁসদা। হাঁসদা কিন্তু কোনোদিন কিছু চুরি করে নি। ভালো ছেলে। তবে সে সেদিন মদ চুরি করল কেন? এ প্রশ্ন কি কখনও জাগে নি মনে? তাছাড়া নতুন বোতল এনে রেখেছিলে; তা খেয়ে ও মারা গেল কেন? এ প্রশ্নও জাগে নি তোমার মনে। জাগে নি। কারণ, সংসারের অত প্যাঁচ তুমি বোঝ নি। এবার তাহলে সত্য শোন।
ওই হাঁসদা-ই ছিল রাকার বাবা। তুমি পিতা হবার যোগ্যতা রাখো না, অথচ পিতা হতে চাও। মুনিমকে পারি নি নষ্ট করতে। তাই হাঁসদাকে লোভে ফেললাম। সরল যুবক। প্রায়ই কাজ করে দিত আমাদের। একদিন তুমি কলেজে। দুপুরে হাঁসদা এল। ওকে লোভ দেখালাম শরীরের। রাজি হলো না। ওরা বড় ভালো। সভ্য জগতের প্যাঁচ ওরা জানে না। ওদের চোখের দিকে তাকালে স্বচ্ছ কুয়োর জলের মতো অন্তরের তলদেশ পর্যন্ত দেখা যায়। ভেতরটা স্পষ্ট। ভাবলাম বিলিতি মদের লোভ দেখালে রাজি হতে পারে। যেই বললাম, চক্‌চক করে উঠল তার চোখ। সে আমাকে একটা প্রণাম করে আমার আহ্বানে সাড়া দিল। বলল– মাইজি, বাবু জানতে পারলি মোকে পুতে ফেইলবো। বলবেননিকো।
সত্যি কথা বলব, অমন সুখ কোনোদিন পাই নি তোমার সাথে। সে কি প্রকৃতির মতো বেড়ে ওঠা বলে? নাকি দ্বিতীয় পুরুষ বলে? যা হোক, এরপর তোমার আলমারি থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি এল। ভাবলাম– ইচ্ছে করলে তো আমি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি এ পাপের চিহ্ন। কী পাপিষ্ঠা আমি। যে আমার উপকার করল, এনে দিল মাতৃত্বের স্বাদ, তাকেই চলছি নিশ্চিহ্ন করে দিতে। পটাশিয়াম সায়ানাইড ছিল বাসায়। তাই মিশিয়ে দিলাম বোতলে। বললাম– রাতে ছাড়া খেও না। চুপি চুপি খেও। কেউ যেন জানতে না পায়। তাহলে রক্ষে নেই। ওরা কত সহজ। কত সরল। সহজে সব বিশ্বাস ক'রে তাই করল।
পরদিন, সকালে সবাই জানল অতিরিক্ত মদ খেয়ে মারা গেছে হাঁসদা। কেউ বুঝল না। কেউ জানল না। থানায় খবর দিল না। পুলিশকে ওরা ভয় পায়। একজন সাঁওতাল মরলেও কারও কিছু যায় আসে না এ সমাজের। তাই এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য হলো না। দু'দিন বাদে হাঁসদার স্মৃতি মুছে গেল সবার মন থেকে। কিন্তু আমার মুছল না। কারণ আমার পেটে তখন হাঁসদার অস্তিত্ব। ধীরে ধীরে বাড়ছিল। অনুভব করছিলাম। প্রতি মুহূর্তে এক পাপ বোধ কুঁরে কুঁরে খাচ্ছিল আমাকে। দু'টো পাপ। এক পাপ ঢাকতে আর এক পাপ ডেকে আনা। অথচ বলি নি কাউকে। বলা যায় নি। বলা যায় না। তাছাড়া আমার পাপকে গোপন রাখতে হবে। আমি ছাড়া আমার পাপের আর কোনো সাক্ষী নেই পৃথিবীতে। অথচ আজ আমিই আমার শত্রু হয়ে প্রকাশ করলাম পাপ। পাপ কখনও গোপন থাকে না। হাঁসদা-ই রাকার বাবা। আমিই হাঁসদার খুনি। অথচ কেউ জানে না হাঁসদা খুন হয়েছে। রাকা যেন না জানে তার জন্মের ইতিহাস। তাহলে ওর জীবনটাও হবে নষ্ট। তোমাকে বললাম এ কারণে যে, অত বড় বন্ধুত্ব মিথ্যের কারণে নষ্ট হলো। আর আমার ঘৃণা পাবার প্রয়োজন ছিল। কেউ ঘৃণা করলে আমার আত্মা একটু স্বস্তি পাবে। আর একটা কথা বলি– সন্দেহ মানুষের সুখকে কেড়ে নেয়। তাই পৃথিবীতে অনেক কিছুই না জেনে সন্দেহ না করাই ভালো। আর সব জিনিস না জানাও ভালো। বাইশ বছর ধরে যে কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি, আজ তা নামালাম। কিন্তু কষ্ট কমে নি। কষ্ট কমে না কখনও– এটাই চরম সত্য। আমাকে খুঁজো না আর।
– শ্যামা।
এ পর্যন্ত বলে থামলেন মিহিরবাবু। আবার দুই পাথর হলেন দু'জন। শুধু সাগরের অশান্ত গর্জন। অথবা দীর্ঘশ্বাস। অনেকক্ষণ চুপচাপ। এরপর নীরবতা ভেঙে বলল তুহিন– এ কী ভয়ঙ্কর সত্য!!!
মিহিরবাবু– কে জানে এই-ই কি সত্য, নাকি আরও কোনো ভয়ঙ্কর সত্য লুকিয়ে রয়েছে এর অন্তরালে? কিছুই জানি না। কিছুই জানা যায় না। নাকি দোষ এড়ানোর জন্য শ্যামার এ এক সাজানো সত্য? বুঝি না। পৃথিবীটা প্রহেলিকায় ঢাকা। রহস্যে ঘেরা। এ কেমন সত্য? আজকের সত্য কাল মিথ্যে হয়ে যায়। সত্য কী? না কি সত্য বলে কিছু নেই? না কি প্রকৃত সত্য কখনও জানা যায় না। যা জানি তা সত্য-মিথ্যেয় মিলিয়ে? What is truth? মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে– মিথ্যেই সত্য। অজানা অজানাই থেকে যায়। তাইত বলি– আমি কে, কী আমার পরিচয়, জানা যায় না–
দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে এরপর হঠাৎ মিহিরবাবু– দেখো তো বাজে ক'টা?
তুহিন– ঘড়ি তো নেই?
মিহিরবাবু– ও, আচ্ছা, অনেক হয়ে গেল রাত মনে হচ্ছে?
তুহিন– তা গোটা দশের কম নয়।
মিহিরবাবু– চলো, চলো, মা আমার একা রয়েছে। কী করছে কে জানে? দুশ্চিন্তা করছে হয়ত।

কী এক ঘোরের নেশায় টলতে টলতে চলে তুহিন। এ কী জানল সে আজ? এত কষ্ট নিয়ে মানুষ বাঁচে কীভাবে? অথচ বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। বাইরে কী শান্ত-শীতল পৃথিবী, অথচ ভেতরে জ্বলন্ত লাভা। এ যেন তুঁত পোকার জীবন। রেশম পোকা। কী চমৎকার সোনালি গুটি। প্যাঁচে প্যাঁচে রেশম সুতো। বাইরে থেকে কে

বলবে, ভেতরে বসে আছে এক পোকা? ও একদিন সুযোগ পেয়ে সুতো কেটে পাখা মেলে পড়বে বেরিয়ে? জীবনটা যেন রেশমগুটি। মানুষ যেন তুঁত পোকা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। নির্বাক হাঁটছে দু'জন। ঝাউবন পেরিয়ে একটা কাঁটাঝোপ পাশে রেখে হাঁটছিল দু'জন আচ্ছন্নের মতো। হঠাৎ ঝোপের পাশে চোখ পড়ে তুহিনের। সড়াৎ করে দৌড়ে গেল এক পাতিশিয়াল। তাকাতেই দেখতে পায় এক লাশ। নগ্ন। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দশমী চাঁদের আলো এসে পড়ছে বুকে। ঝোপের ছায়ার অন্ধকারকে যেন ওই আলোটুকু আরও গাঢ় করে রেখেছে। তাই মুখ দেখা যাচ্ছিল না। শঙ্খসাদা বুক জোড়া নিস্পন্দ। পাশে ছেঁড়া শাড়ি। বুঝে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল– এখানে লাশ কেন কোনো যুবতীর? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মিহিরবাবুও দাঁড়ালেন। তাকিয়ে বললেন– এ কী, এভাবে ... মরে গেছে ... সর্বনাশ ...

তুহিন বলল– যেভাবেই হোক, এ মৃত। এখানে আমাদের এক মুহূর্ত দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। চলুন। সমুদ্র সৈকতে এরকম মাঝে সাজে হয়। পত্রিকায় খবর পাওয়া যায়। হাঙ্গামার ভয়ে দ্রুত পা চালাল দু'জন বাসার দিকে। কিন্তু মনটা ভার হয়ে রইল। কে এই ধর্ষিতা যুবতী কে জানে? কত নিষ্ঠুর মানুষ? কত জানোয়ার? ইচ্ছের বিরুদ্ধে ধর্ষণ করে একটা যুবতীকে মেরে ফেলে রেখে গেছে ঝোপের পাশে। কত বর্বর মানুষ?! মেয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন মিহিরবাবু। দ্রুত চললেন বাসার দিকে।

বাসায় পৌঁছে হতভম্ব তিনি। দরজা খোলা। ডাকলেন– রাকা। কোনো শব্দ নেই। ভেতরে ঢুকলেন। নেই। বাথরুমে ধাক্কা দিলেন। খুলে গেল। নেই। তবে? বাইরে পায়চারি করছে না তো? উচ্চ স্বরে ডাকলেন দু'জনে। নেই। হঠাৎ আকাশ ভেঙে পড়ল মিহিরবাবুর মাথায়। তুহিন ঝাপসা দেখল চোখে। মিহিরবাবু বললেন– তুহিন। ডাকটা কেমন আর্তনাদের মতো শোনাল। তুহিন বলল– শীঘ্র চলুন।

আবার ছুটে এল দু'জন ঝোপের পাশে। ছেঁড়া কাপড়টুকুই কোনোমতে বুকের উপর ফেলে কাঁধে নিয়ে দ্রুত চলল তুহিন। পাগলের মতো হাউমাউ করছেন মিহিরবাবু– এ কী হলো, এ কী হলো!? বাসায় ফিরেই খাটে শুইয়ে দিল তুহিন। দু'চোখ বন্ধ করে মুখে দু'হাত চেপে ইজি চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লেন মিহিরবাবু। বুকের কাপড় সরে গেছে মেয়েটির। তুহিনের চোখ পড়ে সেদিকে। শুভ্র সুন্দর দু'টি স্তন। ভরাট যুবতী বুক। বুক এত সুন্দর হয়?! তুহিনের এই প্রথম দেখা কোনো নারীর নিরাবরণ বুক। শঙ্খসাদা একজোড়া বুকে তার চোখ যেন প্রজাপতি হয়ে যায়। চোখ ফেরাতে পারে না। তার খেয়ালই নেই, এ জীবিত কি মৃত? এর শুশ্রূষার প্রয়োজন আছে কি নেই? সে নেশাগ্রস্তের মতো তাকিয়েই থাকে। এমন মোহনীয় সৌন্দর্য এর আগে কখনও দেখে নি সে।

হঠাৎ তার খেয়াল হয়, এ কী করছে সে? তার ভেতরেও তাহলে একটা পশু লুকিয়ে আছে? তাড়াতাড়ি একটা শাড়ি এনে সারাদেহ ঢেকে দেয় মেয়েটার। এরপর মুখের দিকে তাকায়। এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল মুখের দিকে তাকাতে। ভেবেছিল এ রাকাই। কিন্তু না। আশ্চর্য হয় তুহিন। এ রাকা নয়। তাহলে? চেনে না একে। মিহিরবাবুকে ডাক দেয়। চমকে ওঠেন মিহিরবাবু। সে কী? এ রাকা নয়? তাহলে কে? কিন্তু রাকা কোথায়? একটু স্বস্তি, এ রাকা নয়। আবার দুশ্চিন্তা, তাহলে রাকা কোথায়, না জানি এরও চেয়ে মারাত্মক কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা। কষ্ট। হায়রে হতভাগ্য মেয়ে, কে তুই? মেয়ের চিন্তা মাথায় রেখে আপাততঃ এ মেয়ের দিকে নজর দিলেন। হাত ধরে নাড়ি টিপলেন। যেন স্পন্দন পাওয়া গেল। বললেন– তুহিন, তুমি শীঘ্র ডাক্তারের কাছে যাও। ডাক্তার ডেকে আনো। মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে। রাকার কথা পরে ভাবা যাবে। তুহিন চলে গেল ডাক্তার ডাকতে। মিহিরবাবু মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন।

হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার পেল না তুহিন। বাসায় চলে গেছে। কোনো ডাক্তার নেই। ঠিকানা নিয়ে এক ডাক্তারের বাসায় গিয়ে হাজির। তিনি রাজি নন আসতে। অনেক অনুনয়-বিনয় শেষে তিনি রাজি হলেন। ডাক্তার এসে সেলাই করলেন ক্ষত। ইনজেকশন দিলেন। ঔষধ দিয়ে সকালে খবর জানাতে বললেন রুগিণীর অবস্থার। ডাক্তারকে রেখে বাকি ওষুধ কিনে আনল তুহিন। মেয়েটির জ্ঞান ফেরে নি তখনও। ঘুমের ইনজেকশন দেয়ায় ঘুমুচ্ছে এখন। মিহিরবাবুকে বসিয়ে রেখে তুহিন একা বেরুল রাকার খোঁজে। ওই রাত এগারটায় কোথায় খুঁজবে তাকে? সারা সমুদ্র সৈকত তন্ন তন্ন করল। পেল না। বাজার, বস্তি কোথাও বাদ রাখল না খোঁজা, পেল না।

অবশেষে ঘণ্টা দু'তিন বাদে থানায় খবর দিয়ে ফিরল তুহিন। দুঃখের তিন দশা। ঘরে জ্বালা, বাইরে জ্বালা, অন্তরেও জ্বালা মিহিরবাবুর। কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। খাওয়া হয় নি কারও। রাত প্রায় তিনটে। এ সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মেয়েটি। একটু নড়ে। তারপর আস্তে আস্তে চোখ খোলে। মনে হয় শতাব্দীর ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে মহিয়সী নারী। যেন কার পদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা লক্ষ যুগের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণ পেল ফিরে। জ্ঞান ফিরল। কিছু না বলে তাকিয়ে থাকল ফ্যাল ফ্যাল চোখে। মিহিরবাবু বললেন– মা, একটু সুস্থ বোধ করছ? শুনল কি শুনল না, বোঝা গেল না। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। যেভাবে তাকিয়েছিল, সেভাবেই থাকল তাকিয়ে। এরপর আবার চোখ বন্ধ।

দুশ্চিন্তা কাটলেও সংশয় কাটে নি কারও। কে এই মেয়ে? কী এর পরিচয়? কী করবে তারা একে নিয়ে? ক্ষিধে মোচড় দিয়ে ওঠে পেটে। খেতে পারে না। মেয়েটাকে রেখে কী করে খায়? মিহিরবাবু অনড় পাথর। কিছু না খেলেও চলে না। উঠে গিয়ে ফ্রিজ খোলে তুহিন। পাউরুটি আর মাখন বের করে আনে। যেন তার নিজের ঘর এটা। মিহিরবাবুকে দু'টুকরো দিয়ে, নিজে দু'টুকরো নেয়। তুহিন খেয়ে ফেলে। মিহিরবাবুর পিরিচ না ধরাই থাকে। শূন্য দৃষ্টি। উদাস দৃষ্টি বিছিয়ে দেন সৈকতে সৈকতে। তা যেন ছড়িয়ে পড়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। যেন প্রতিটা বালুকণায় খুঁজে ফেরেন হারানো রাকা। ফেলে আসা দিনের রাশি রাশি সুখ। পান না।

রাত যত গভীর হয়, সমুদ্রের গর্জনও তত বাড়ে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের হাহাকার বুকে ধরে যেন সে ফুঁসতে থাকে অনাদি অনন্তকাল। নির্জনতা বা নৈঃশব্দ তাকে আরও বাড়িয়ে দেয় বহু বহুগুণ। সর্বদুঃখসংহারক। মুক্তিদায়ক। সমুদ্রের এই বিশালত্বের কাছে এলে দুঃখ-কষ্ট সব তুচ্ছ হয়ে যায়। যেন কোনো মায়ার পরশ বুলিয়ে সব ব্যথা ভুলিয়ে দেয় সমুদ্র। প্রাণ ভ'রে তাই সমুদ্রের সংগীত শোনে উদাস মনে। কিছুক্ষণের জন্য যেন জগৎ সংসার স্থির। নিশ্চল।

তুহিনের হয়েছে যত জ্বালা। যত দূরে যেখানেই যায়, জ্বালা তার পিছে পিছে ধায়। হিমানীকে ফেলে এসেছে সেই দূর মেঘশিমুলে। জ্বালা ভুলতে চেয়েছে। পারে নি। জড়িয়েছে অন্য জ্বালায়। রাকা পালিয়েছে। পায় নি খুঁজে। এরই মধ্যে জুটেছে অন্য মেয়ে। নির্বাক। অচেনা। কে তার হিমানী? কে তার রাকা, কে এই মেয়ে? কেন তবে কষ্ট পাওয়া? সে যেন কাঁঠালের ভুঁতি; যেখানেই ফেল, যন্ত্রণার মাছিরা উড়ে ঠিকই আসবেই। পাঁজরে পাঁজরে কষ্টের কাঁটা। সে যেন মরুর বুকে কষ্টকাঁটার ক্যাকটাস। তার সে কাঁটায় কি কখনও ফুটবে না কোনো ফুল? কষ্টটাই সত্যি শুধু? মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই গান–

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে, ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।'

ছয়

পাথর শুয়ে থাকে মেয়ে। এক আকাশ হতাশা জ্বেলে উদাস দৃষ্টি মেলে দেয়ালে তাকিয়ে থাকেন মিহিরবাবু। চেয়ারে গিয়ে নির্বাক বসে পড়ে তুহিন। টেবিলের উপর একখানা বই চেয়ে আছে তুহিনের মুখের দিকে। Milton এর Paradise lost, আনমনে টেনে নিল বইটা। তার নিচে ভাঁজ করা একটা কাগজ। এবার বই থেকে মনটা চলে গেলো কাগজে। খুলল। রাকার হাতের লেখা সে চেনে না। তাই বুঝল না কার চিঠি। বাবাকে লেখা। ইতি দেখল। রাকা। দপ্ করে উঠল ভেতরটা। কী ইঙ্গিত বহন করে এ চিঠি? আগে তুহিন ভেবেছিল– বাসায় একা ছিল রাকা। সেই সুযোগে হয়ত কোনো দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়েছে রাকা। কিংবা সন্ধের অবকাশে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিল কাছে কোথাও, সেই ফাঁকে দুর্বৃত্তের কবলে পড়েছে। মাঝে মাঝে এরকম ঘটে এখানে। এখন দেখে তার ভাবনা মিথ্যে। তাহলে আর চিঠি লিখতে পারত না। তবে কি সে স্বেচ্ছায় চলে গেছে? একটু নিশ্চিন্ত হয়ে শঙ্কান্বিত হয়ে পড়ে আবার। দুর্বৃত্তের হাত থেকে বেঁচেছে সে। কিন্তু তাহলে গেল কোথায়? কেনই বা গেল? এক শঙ্কা কাটাতে না কাটাতেই অন্য শঙ্কা এসে দেখা দিল। মানুষ হাঁফ ছাড়তে পারে না। এক শঙ্কা যায়। কিন্তু পেছনে তার ওঁৎ পেতে থাকে আর এক শঙ্কা। কী জানি কী আছে ওই চিঠিতি? ভাবছে তুহিন। স্বেচ্ছায় চলে গেছে রাকা। যাবার কারণ হয়ত গেছে লিখে। মিহিরবাবুকে কি আগেই ঠিক হবে দেয়া? ভাবল– আগে পড়ে দেখাই যাক না ওটা? চিঠিটা মেলে ধরে টেবিলে তুহিন। তাতে লেখা–

বাবা,
শেষ প্রণাম। বুঝতে শেখার পর থেকে শ্রদ্ধা করে আসছি। এখনও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সেই সাথে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ঘৃণা করি তোমাকে। তুমিই শিখিয়েছ– সবচেয়ে বড় পাপ, সবচেয়ে ঘৃণ্য– মিথ্যা। অথচ সারাজীবন আমাকে ঢেকে রেখেছ মিথ্যের আবরণে তুমিই। চরম সত্য, তুমি আমার বাবা নও। অথচ সারাজীবন এ মিথ্যেকেই পরম সত্য হিসেবে বয়ে বেড়াতে হয়েছে আমাকে। আর তুমিও সে সত্য লুকিয়ে ভেতরে বাবার অভিনয় করে গেছ। কত বড় অভিনেতা তুমি? আমি ঘৃণা করি তোমাকে। কোন পরিচয়ে বেঁচে থাকব আমি? কী আমার পরিচয়? মেনে নিতে পারছি না এই মিথ্যের আবরণে ঢাকা সত্যকে। প্রচণ্ড এক যন্ত্রণা আমার। এ নিয়ে কী করে বাঁচব? কেন বাঁচব? এত যন্ত্রণা নিয়ে কেউ বাঁচে না। বাঁচতে পারে না।
তোমাদের ফিরতে দেরি দেখে আমি সৈকতে গিয়ে নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়িয়ে শুনে ফেলি কালো পর্দার আড়ালের কথা। যা জেনে আসছি, সব মিথ্যে। যা জানি সব মিথ্যে। সমস্ত জানা সত্যেরা কি এমনি মিথ্যে হয়ে যায়? এ পৃথিবী বড় ঘৃণ্য লাগে আমার। দার্শনিক বলেই তুমি পার বলতে– আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। আমি পারি না। আমার চেতনার রঙে সব হয়ে যায় গাঢ় কালো যন্ত্রণার পাথর। পান্না হয় পাথর। চুনি হয় পাথর। কালো। যন্ত্রণা দগ্ধ। লাল নয়, সবুজ নয়, নয় নীল। সে শুধু কালো– কালো– এক আকাশ গাঢ় কালো অন্ধকার। সীমাহীন অন্ধকার। যাই বাবা– বিদায় ...
– রাকা।
তুহিনের চোখে গাঢ় কালো অন্ধকার। লক্ষ লক্ষ মাকড়সা কালো কালো জাল বোনে অন্ধকারে। সেই জালে সব আটকা। নাকি প্রতিটি মানুষই মাকড়সা। শুধু জাল বোনে। গাঢ় কালো– মায়ার জাল– মোহের জাল? তুহিনও মাকড়সা। অদ্ভুত সব কাণ্ড। দেখতে পায় তুহিন– সাগর ফুঁসছে। বিরাট বিরাট ঢেউগুলো কালো। অন্ধকারের তরঙ্গ। তরঙ্গের মধ্যে ভেসে উঠে মিলিয়ে যায় জীবন। জন্ম-মৃত্যুর দু'পাড়ের মাঝখানে কালো স্রোতের ঢেউ। কালো– কালস্রোত। মাঝে তার ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়, ভালোবাসা– প্রেম– মোহ– মায়া– আসক্তি। সব ভেঙে যায় টুকরো টুকরো হয়ে। কালো কাচের মতো। আবার হারিয়ে যায় কালোতেই। কী করা যায়, বুঝে উঠতে পারে না তুহিন। মিহিরবাবুকে কি এখন দেয়া ঠিক হবে কাগজটা? অনেক ভেবে জামার পকেটে রাখল। আশ্চর্য। পকেটের ম্যাচের প্যাকেট যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি জ্বলে উঠল তার বুক। তবুও থাকল। বলল না মিহিরবাবুকে। তিনি তা সহ্য করতে পারবেন না এ মুহূর্তে।
মিহিরবাবুকে একা বসিয়ে রেখে বাইরে ছুটে আসে তুহিন। ছোটে সে সৈকতে। আকাশের গা পিছলে পড়া জ্যোৎস্না যেন আগুন। সৈকতময় জ্বলজ্বল করে বালু নয় যেন ভাঙা কাচ। তার ওপর হেঁটে চলে তুহিন। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ অবিরত। অশান্ত ঢেউগুলো ছটফট করছে। তুহিনের চোখ খোঁজে ভেসে ওঠা রাকার লাশ। কী আশ্চর্য! লাশই যেন প্রিয় তার। রাকাকে জীবন্ত পাবার প্রত্যাশা এখানে লাশ হয়ে গেছে। তাই লাশই প্রত্যাশা। প্রতিটি ঢেউয়ের চূড়ায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেরা দৃষ্টি তার ভেঙে পড়ে অশান্ত গর্জনে। খান খান হয়ে যায় বুক। বসে পড়ে। যন্ত্রণায় কাৎরায় সমুদ্র। দাপাদাপি করে তরঙ্গ। তুহিন ভাবে– জীবনটা এত যন্ত্রণার কেন? কেন এত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে জগৎ? আরও কি সুন্দর, আরও কি শান্তির পারে না হতে? ক্ষণেকের জন্য হিমানীর কথা মনে পড়ে। ভাবে– নতুন শোক এসে ঢেকে দেয় পুরনো শোক। নতুন যন্ত্রণা এসে ভুলিয়ে দেয় পুরনো জ্বালা। নতুন বেদনা মুছে দেয় পুরনো

বেদনা। শুধু জ্বালা দিয়ে জ্বালাকে ঢাকা-ই জীবনের খেলা। হিমানীর ব্যথা ভুলতে এসে এই নির্জনে পেল নতুন স্বজন। হঠাৎ তুহিনের মনে হলো, রাকাকেও কি মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে সে? কোন্ ফাঁকে ভালোবাসা এসে প্রবেশ করে মনে? নাকি সহানুভূতি? বুঝতে পারে না। তবে হিমানীর স্মৃতি আজ মৃত তার কাছে। প্রত্যক্ষ ঢেকে দেয় বিগত স্মৃতি। হিমানী আর রাকা কি তাহলে ভালোবাসার এপিঠ-ওপিঠ? এ বড় রহস্য। মানুষ কাকে ভালোবাসে? কী ভালোবাসে? আকাশে ভেসে থাকা মেঘের দিকে তাকিয়ে আওড়াতে থাকে–

'বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাস;
তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, অথবা ভগ্নীকে?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী– কিছুই নেই আমার।
তোমার বন্ধুরা?
ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানি নি।
তোমার দেশ?
জানি না কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।
সৌন্দর্য?
পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে– দেবী তিনি, অমরা।
কাঞ্চন?
ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।
বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালোবাস তুমি?
আমি ভালোবাসি মেঘ ... চলিষ্ণু মেঘ ... ঐ উঁচুতে ... ঐ উঁচুতে ...
আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল!'

বসে থাকতে থাকতে দেখে স্থির চাঁদ, স্থির আকাশ, স্থির তারা। সব পাথর। পাথর পাথার। তার বুক ভাঙছে অথচ জগৎ চলছে আপন খেয়ালে। কত হৃদয় ভাঙছে। কত প্রাণ ঝরছে, অথচ ভ্রূক্ষেপ নেই সময়ের। জগতের। থামছে না। চলছে সে আপনার তালে। কোনো শোক কিংবা সুখ পারছে না তাকে টলাতে। অথচ মানুষ পারে না স্থির থাকতে। পারে না কেন? এ প্রশ্ন বিদ্ধ করে তাকে। এ মুহূর্তে নিজেকেই তার Statue মনে হয়। মনে হয় পাথর। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেলে মানুষ পাথর হয়ে যায়। এ সময় পাথর আকাশের গায়ে বুনোফুলের মতো শুকতারা ফোটে। পৃথিবীর ভোর হবে। হয়ত ঢেউয়ে ভেসে আসা রাকার লাশ উদ্ভাসিত হবে দিনের আলোয়। দেখবে তুহিন প্রাণহীন রাকা। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নার মতো রাকার শরীর। সে দৃশ্য ভাবতেই শিউরে ওঠে তুহিন। আবিষ্কার করতে চায় না রাকার শরীর। উঠে পড়ে। চলে আসে বাংলোয়।

নিঃশব্দে সকাল আসে। শুরু হয় নতুন এক দিন। রোদ আসে। রাকা আসে না। পাথর মেয়েটা চোখ মেলে। কথা বলে না। কথা শোনে কিনা তা-ও বোঝা গেল না। মেয়েটা কি মূক ও বধির? ডেকেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। নাকি মানসিক কোনো আঘাতে এমন বিধ্বস্ত? বোঝা গেল না। ঘুম ঘুম চোখে কফি করে তুহিন। ড্রাই কেক আর কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়ে খোঁজে। তখনও বলে না রাকার চিঠির কথা।

নুলিয়ারা নেমে গেছে জাল নিয়ে সমুদ্রে। কেমন কালো কালো চেহারার জোয়ান সব। কী তাদের ভাষা, বোঝে না তুহিন। ওড়িয়া। রাঙা কিশোরীর মতো ঢেউয়ের ভেতর ডুব মেরে মেরে জাগছে কচি সূর্য। তার নরম রোদ– লালচে লজ্জা– জলের বুকে– সাগরময়। জাল টেনে কিনারে এসে জাল ঝাড়ছে। গোটা কয়েক শামুক, কয়েকটা শঙ্খ, কী সুন্দর কতগুলো ঝিনুক! যেন কোনো মহাশিল্পী তার সযত্ন তুলির আঁচড়ে এঁকে রেখেছেন ঝিনুক। এত অপূর্ব, কোনো মানুষের পক্ষে এত সুন্দর আঁকা অসম্ভব। কতগুলো সামুদ্রিক মাছ উঠেছে। কয়েকটা জেলি ফিশ। কয়েকটা তারামাছ। Biology বইয়ে পড়েছিল বলেই চিনতে পারল। তারামাছটা অদ্ভুত সুন্দর। পাঁচটা পাপড়ির মতো। মনে হয় যেন ফুল। জেলি ফিশটা বেশ মজার। দেখতে চালতা ফুলের মতো নরম। থক্‌থকে। পিচ্ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তুহিন। কিচ্ছু ভাল্ লাগছিল না তার। ওদের কথাও বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ যেন মনে হলো কী যেন ওরা বলছে। হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি-ওড়িয়া মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি ভাষায় সে প্রশ্ন করে জানল আর বুঝল যা নুলিয়াদের কাছ থেকে, তা এরকম যে, রাতে একটা মেয়ে আত্মহত্যা করতে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নুলিয়ারা টের পেয়ে তাকে উদ্ধার করে অজ্ঞান অবস্থায় এবং তাদের বস্তিতে নিয়ে যায়। চেষ্টা করে সুস্থ করতে। ব্যর্থ হয়ে অনেক রাতে হাসপাতালে নিয়ে আসে। মেয়েটা কি বেঁচে আছে, না মরে গেছে এ-ই তাদের আলোচনা।

শুনে এক মুহূর্তও দেরি করল না তুহিন। আর স্থির রাখতে পারল না নিজকে। আগুনের মতো হাল্কা হয়ে গেল সে। মাথার মধ্যে গন্‌গনে চুল্লি। বুকের ভেতর ইঞ্জিনের ধস্‌ধস্‌। রাতে তো সে এই হাসপাতালেই এসেছিল? দ্রুত পা চালাল হাসপাতালের দিকে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে হাসপাতাল পাওয়া গেল এবং তারও চেয়ে বেশি খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল রাকাকে। অচেতন। ঘুমুচ্ছে। স্যালাইন চলছে। নার্স তার ভাষায় বুঝাল– মানসিক কোনো আঘাত পেয়েছে। নার্ভ খুব দুর্বল। ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে। এখন ডাকা যাবে না। পরে আসুন। তার বিশ্রামের খুব দরকার।
নিস্পন্দ শুয়ে আছে রাকা। বিছানায়। মুখখানা তার শরৎ আকাশের মতো নির্মল। তাতে কোনো দাগ নেই, কলঙ্ক নেই; ভাব নেই, রাগ নেই। কী এক গভীর টান অনুভব করে তুহিন। রাকা যেন সমুদ্র। তুহিন নদী। দুর্বার ছুটে যেতে চায় মন। এমন শুভ্র পবিত্রতা এর আগে কখনও কোনো মুখে দেখে নি সে। মুখের স্বচ্ছতা ভেদ করে অন্তরের তলদেশ পর্যন্ত যেন দেখা যায়। কে বলবে সেখানেও রয়েছে দুঃখের কাদা-জল; যন্ত্রণার হাঙর-কুমির? কষ্টরাশি! যাক, তবু পাওয়া গেল– এটাই স্বস্তির। মিহিরবাবুকে খবরটা দিতে হয়। ওদিকে তিনি দুশ্চিন্তায় আছেন। তুহিন বাংলোর দিকে পা চালাল দ্রুত। হাসপাতাল থেকে বেশ খানিকটা দূরে বলে রিক্সা নিল।
তুহিনকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিহিরবাবু– কোনো খোঁজ পেলে বাবা?

- হ্যাঁ, নুলিয়ারা বাঁচিয়েছে। এখন হাসপাতালে। ঘুমুচ্ছে। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। নার্স বলল, এখন আশঙ্কামুক্ত।
- আমাকে এক্ষুণি নিয়ে চল আমার মায়ের কাছে।
- ব্যস্ত হবেন না। একটু পরে গেলেও অসুবিধা নেই। তাছাড়া এখনই হয়ত ওরা দেখা করতে দেবে না আপনাকে। ঘুমুচ্ছে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আর এ মেয়েটিকে ই বা একা রেখে কী করে দু'জনে যাই?
- তা যা বলেছ। তাহলে আমি একাই যাই। তুমি থাকো ওর কাছে।

অচেনা আত্মীয়ের মতো নাম না জানা মেয়েটি পাথরের মূর্তি হয়ে বসে থাকে বিছানায়। জানালা দিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে, উদার সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকে নিস্পলক। দু'চোখে শুকনো অশ্রুর ধারা। কথা বলে না। কিংবা বলতে পারে না। কঠিন আঘাতে নির্বাক। প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা মুহূর্তকে ঠেলে দেয় আরও কঠিন কোনো সমস্যার দিকে। তুহিন ভাবে– প্রতিটা জানার পেছেনে আরও কঠিন কত ভয়ঙ্কর অজানা লুকিয়ে থাকে। এই সব সমস্যার কাছে তুহিনের সমস্যাকে বড় তুচ্ছ মনে হয়। তৈরি হয়ে মিহিরবাবু বেরিয়ে যান রাকার উদ্দেশে। যাবার মুহূর্তে বারুদের মতো ভয়ঙ্কর চিঠিটা পকেট থেকে বের করে মিহিরবাবুর হাতে তুলে দেয় তুহিন। একা তুহিন বসে থাকে অচেনা আত্মীয়ের কাছে। বুঝে উঠতে পারে না তুহিন কী করবে সে; কী করা উচিত তার এখন। নিঃসঙ্গ ক'টা দিন কাটাতে এসে এ কোন সঙ্গতায় জড়াল সে? দুঃখ এমন এক পাথর, যা না চাইতেই পেয়ে যায় মানুষ।
মেয়েটা খায় না, শোয় না; কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। কেবল ঠায় বসে থাকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে। তার চোখেও এক সমুদ্র এখন। তার নিঃশ্বাসে তুহিন ঝাউবনের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায়। সেও বসে থাকে এই সব ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে এক অচেনা সমুদ্র হয়ে। তুহিন আর ভাবতে পারে না। তাই তালবনে সূর্যাস্তের ছবির দিকে তাকিয়ে তুহিন ফিরে যায় মেঘশিমুল গ্রামে। হিমানীর ছায়ার কাছে। হিমানীর ছায়া দীর্ঘ হতে হতে তাল গাছের মতো। ছবিতেও সূর্য ডোবে। হিমানী ক্রমশ ঝাপসা থেকে গাঢ় অন্ধকার হয়ে যায়। কল্পিত অন্ধকারে একলা তুহিন বসে থাকে যেন অনন্ত অনন্তকাল।
হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসে এক মর্মন্তুদ আর্তনাদ– তুহিন, মা আমার পালিয়েছে। হাসপাতালে নেই। কেউ কিছু বলতে পারল না কোথায় গেছে। আমি বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। কোথাও নেই। পেয়েও পেলাম না। আমি এখন কী করব? কিছু একটা করো।
দু'হাতে চোখ ঢেকে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন মিহিরবাবু। কী করবে সে? তুহিন তো জগৎ সংসারের নিয়ন্তা নয়? সেও তুচ্ছ এক দাবার ঘুঁটি। সে নিজেই জানে না, এরপর কোন কোর্টে চাল দেয়া হবে তাকে। হিমানী, রাকা, অচেনা মেয়ে– তিনজনই যেন একই সুতোয় গাঁথা কোনো রুদ্রাক্ষের মালা। নাকি কাঁটার মালা? যন্ত্রণার মালা? 'গাহি গান, গাঁথি মালা; কণ্ঠ করে জ্বালা; সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা।' সমুদ্র-মন্থনের বিষ পান করে সে যেন নীলকণ্ঠ। কে আপন, কে পর? কী তার দায়? বুঝে পায় না।
যন্ত্রচালিতের মতো, মন্ত্রচালিতের মতো তবু ওঠে। ছুটে বেরিয়ে যায়। কোথায়, তা জানে না। গন্তব্যহীন খোঁজা। খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর। তুহিনের জন্মই যেন শুধু খোঁজার জন্য। পথের জীবন পথে পথেই কাটে। তুহিন ছোটে। পাওয়া নয়, খোঁজাটাই যেন মুখ্য এখানে। কী খোঁজে সে, কাকে খোঁজে? জানে না। খোঁজাটাই সত্য, আর সব মিথ্যে। মাঘী পূর্ণিমায় যে পুকুরের জল দুধ হয়ে যায় সে পুকুরের চার পাড়, জগন্নাথদেবের মন্দির, যে বকুলের

ডাল দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব দাঁত মেজেছিলেন সে গাছের চারপাশ, সমুদ্র সৈকত– সর্বত্র খুঁজে অবশেষে শ্মশান পর্যন্ত এসে যাত্রা বিরতি। এখানেই তো জীবনের যাত্রার পূর্ণচ্ছেদ। তুহিন ক্লান্ত। বসে কিছুক্ষণের জন্য।
কেউ একজন জ্বলছে চিতায়। আগুনে পুড়ে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মিশে যাচ্ছে হাওয়ায়। আকাশে উঠে নিভে যাচ্ছে জীবনের ফুলকি। একটু আগেও যে ছিল, এখন সে নেই হয়ে গেল। প্রিয়জনের চোখে এখনও শোকের অশ্রু। দু'দিন বাদে তাও নিঃশেষ হবে। আরব সাগরের পরপারে দূরে পশ্চিমে আবারও রক্তিম মেঘের ভেলা। আরেকটি সূর্যাস্তের খেলা। দিকচক্রবালের কিনারে ডুবমান সূর্যের অন্তিম বিলাপ। শালগ্রাম শিলার মতো ঠুটো জগন্নাথ হয়ে শ্মশানেই বসে থাকে তুহিন। সময় স্থির যেন। ভ্রূক্ষেপ নেই তার। সে ভুলে যায় তার কর্তব্য-কর্ম। বসেই থাকে।

রাত কত হলো, খেয়াল নেই। আগুন নিভে গেছে অনেক আগেই। চিতার বেদিতে এখন আর উত্তাপও নেই কোনো। এভাবেই উষ্ণতাকে গ্রাস করে শীতলতা। মানুষও হিম হয়। একরাশ যন্ত্রণা থেকে খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যায় যন্ত্রণাশূন্য। এক জীবন, কত তাড়াতাড়িই না ছাই। টের পায় ক্ষিধে পেয়েছে। পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে দানব। কিন্তু উঠতেও ইচ্ছে হয় না। শ্মশানের সন্ন্যাসী মনে হয় নিজকে। দূরে কোথাও কুকুর কাঁদছে। কুকুরেরও শোক আছে তাহলে? সেও কাঁদে। কুকুরেরও স্বজন থাকে? তুহিনের কোনো স্বজন নেই। কোনো আত্মীয় নেই। সে একা। খুব বেশি একা। সে কুকুরের চেয়েও অধম। তারও ভেতরে জমে আছে যথেষ্ট কান্না। কুকুর নয় বলেই সে কুকুরের মতো গলা ছেড়ে কাঁদতে পারে না। সে বুঝতে পারে, সে মানুষ। সভ্য। সভ্যদের কাঁদতে নেই। এ মুহূর্তে কুকুরের চেয়েও অসহায় মনে হয় নিজকে। খেয়াল হয়, সে রাকাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।
এক সময় উঠে পড়ে। মিহিরবাবু হয়ত দুশ্চিন্তা করছেন। পা দু'টো টলতে থাকে। সৈকত ধরে হাঁটে। একটা মাতাল বিড়বিড় করে গান গাইছে, আর বালি দিয়ে কী যেন বানাচ্ছে। মাতাল না পাগল, তা অবশ্য বোঝার উপায় নেই। দূর থেকে দেখছে। অনেকক্ষণ বসে বানাচ্ছে। আর হঠৎ একটা ঢেউ এসে ভেঙে দিচ্ছে বালির সৌধ। পাগলটা সমুদ্রকে গালাগাল দিচ্ছে। বুক চাপড়ে কাঁদছে। আবার শুরু করছে সৌধ বানাতে।
রাকাকে পাওয়া গেল না। দু'দিন খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না। তুহিনের ছুটিও এদিকে শেষ। দু'এক দিনের মধ্যেই রওনা দিতে হবে দেশের দিকে। এক বুক যন্ত্রণা পুরীর সমুদ্রে ধুয়ে যেতে এসে, এক বুক বালু আর লোনা জলের কান্না গায়ে মেখে ফিরবে তুহিন। রাকা নেই। কী হবে মিহিরবাবুর? অচেনা মেয়েটিই বা কোথায় যাবে? ও তো কেউ নয় মিহিরবাবুর? ওকে কি সঙ্গে নেবেন তিনি? কেন নেবেন? কেনই বা নেবেন না? মেয়েটার কী গতি হবে? রাকাও তো মিহিরবাবুর কেউ নয়? কে কার? মনে পড়ে সেই পুরাতন শাস্ত্রীয় বাণী– কা তব কান্তা?

ঝড় শেষের বৃক্ষের মতো মিহিরবাবু কেমন বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন। তিনি আর কথায় কথায় কবিতা আবৃত্তি করেন না। খলবল করে হেসে ওঠেন না। অনেক দিনের অনেক জমানো কষ্টও হার মেনেছে তাঁর এ কষ্টের কাছে। কষ্টের উপর কষ্ট জমে কষ্টের সৌধ হয় গড়া। স্মৃতি থেকে স্মৃতি যদি মুছে ফেলতে পারত মানুষ, অনেক স্বস্তি পেত জীবনে। নিঃসঙ্গ তিন জন চুপচাপ বসে থাকেন নিঃসঙ্গ তিনটি মোমশিখা হয়ে। জ্বলেন আর গলেন। আর ক্ষয়ে ক্ষয়ে যান। তিন রকম কষ্টের তিন জন পুতুল মানুষ।
মনে পড়ে রাকার গানের সেই কলি– 'ফেরারি পাখিরা বুঝি ফেরে না ঘরে'। তবুও তো ফিরতে হবে তুহিনকে। ফিরতে হবে দেশে। ছুটি শেষ। মিহিরবাবুকে ফেলে, অচেনা মেয়েকে ফেলে, রাকাকে ফেলে, পুরীর নির্জন সমুদ্র সৈকত ফেলে তাকে ফিরতে হলো। স্টেশনে কেউ আসে নি তাকে এগিয়ে দিতে। পা দু'টো বেশ ভারি হয়ে ওঠে ট্রেনে উঠতে। পুরী স্টেশন ছেড়ে যায় এক সময় ট্রেন। ট্রেনের হুইসেলটা সূক্ষ্ম তীরের মতো ঢুকে যায় হৃৎপিণ্ডের গায়। তাকে বিদ্ধ করে। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তুহিন টের পায়, তার বুকের ভেতর ইঞ্জিনের অশান্ত গর্জন। রেলের চাকায় হৃৎপিণ্ড পিষ্ট করে ছেড়ে যায় কষ্টের শহর। দুঃস্বপ্নের মতো স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চায় সৈকতের স্মৃতি। পারে না। পারে না । ক্লান্ত হয় সে। অনেকের ভিড়েও সে আজ নিতান্তই একা। একা।

সাত

তুহিন ফিরে আসে ঢাকা। কলেজে যোগদান করে। কিন্তু মন বসে না কিছুতেই। মাথার ভেতর ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাস। হিমানী, রাকা, অচেনা মেয়ে– তিন যন্ত্রণার তিন নাম যেন শীতল তিনটি স্রোত হয়ে ত্রিবেণী তীর্থে পরিণত হয়। সেখানে যন্ত্রণার ঘূর্ণি। হিমানী, রাকা, অচেনা মেয়ে– তবে কি একই যন্ত্রণার তিন ভিন্ন সংস্করণ? নাকি বারে বারে হিমানীকেই নানাভাবে পাওয়া? দর্শনের কোনো তত্ত্বেই মেলে না হিসেব। বড় একা একা লাগে। তুহিন একা। মিহিরবাবু একা। রাকা একা। অচেনা মেয়ে একা। হিমানী একা। সবাই একা। একা? হিমানী কি একা? সে কীভাবে একা? তার তো বিয়ে হয়েছে? স্বামী আছে, সংসার আছে। সুখে আছে। একা হয় কী করে? তার খুব দেখতে ইচ্ছে করে হিমানীকে। হিমানীর সংসারকে। হিমানীর সুখকে। হিমানীর ভালোবাসাকে।
স্মৃতি যেন প্যান্ডোরার ঝাঁপি। খুললেই রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা। তবুও মানুষ খোলে স্মৃতির দুয়ার। সন্তর্পণে ঢোকে স্মৃতির ঘরে। ভেতরে ঝুলপড়া, কালিপড়া, ভ্যাপসা গন্ধময় পুরনো যন্ত্রণা। কী মনে করে পুরী থেকে এক কৌটা সিঁদুর আর একটা মুক্তোর মালা কিনে এনেছিল তুহিন। কার জন্য, কার কথা ভেবে, তা সে জানে না। সে কি হিমানীর কথা ভেবে, নাকি অন্য কারো, তাও জানে না সে। অবচেতনে কি হিমানীই ঢুকে পড়েছিল নিউরনের মধ্যে? জানে না তুহিন। দু'দিন বিশ্রাম নেয়ার পর ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে পড়ল সিঁদুরের কৌটা আর মুক্তোর মালা। খুলে পড়ল স্মৃতির ঝাঁপি। অন্তরাত্মার সমূলে ধরে নাড়া দিল হিমানী। সুনামির মতো ঢুকে পড়ল তুহিনের সমস্ত চেতনায়। আবার সেই পুরনো কষ্ট এসে ভ্যাম্পায়ারের মতো ঝাপটে ধরল তুহিনকে। অসহায়ের মতো অবশেষে কষ্টের কাছেই আত্মসমর্পণ।
মন ভালো নেই তুহিনের। মিহিরবাবুর কষ্টের কাছে তার নিজের কষ্ট কেমন ম্লান হয়ে যায়। এই বুড়ো বয়সে এত কষ্ট কী করে সইবেন তিনি? কী নিয়ে, কাকে নিয়ে বেঁচে থাকবেন তিনি? মিহিরবাবু যেন এক কষ্টমানব। তবুও কষ্ট। সবার কষ্টটাই যেন তার কষ্ট হয়ে মিশে আছে বুকে। মানুষের যেন কষ্টটাই সত্যি, আর সব মিথ্যে। বাইরেটা দেখে মানুষের বোঝাই যায় না তার ভেতরের কষ্টটা। প্রতিটা মানুষই কোনো না কোনোভাবে বয়ে বেড়াচ্ছে এক অসহনীয় কষ্ট। প্রত্যেক মানুষের ভেতরই বয়ে চলেছে ফল্গুর মতো এক কষ্টের নদী। কাগজ টেনে বসল। বহুদিন পর লিখল–

কষ্ট তো আর খাঁচায় পোষা নষ্ট কোনো পাখি নয়
ছাড়া পেলেই ফুড়ুৎ করে উড়াল দেবে দূর কোথা;
কষ্ট সে তো বুকের ভেতর খেয়ালি এক কাঠঠোক্‌রা
হঠাৎ আসে ক্ষণেক বসে অবুঝ আজব এক তোতা।
খাঁচা খোলা থাক বা না থাক সুযোগ পেলেই বেঁধে বাসা
আপন মনে বুকের পাঁজর ঠুকতে থাকে তীর ঠোঁটে;
মেঘের ভেতর আগুন যেমন বুকের ভেতর থাকে তেমন
সুধা ঢেলে গাইতে গেলে বিষাদমাখা সুর ফোটে।

কলেজের ক্লাস শেষে সেদিন টিচার্স কাউন্সিলে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন শিক্ষক। গোগ্রাসে শুনছিল সবাই তুহিনের বেড়িয়ে আসার গল্প। এ সময় ডাকপিওন এসে চিঠি দিয়ে গেল হাতে। বিয়ের কার্ড। খুলতে ইচ্ছে হলো না। কে আছে তার আপনজন, যার বিয়েতে যেতে পারে সে? আর যেতেও ইচ্ছে জাগে না কোনো বিয়েতে। কার বিয়ে, কোথায় বিয়ে– কিচ্ছু জানতেও ইচ্ছে করে না। ডায়েরিটা খুলে ঢুকিয়ে রাখল ভেতরে। ফিরল বাসায়।

নানা কাজের ঝামেলায়, নানা দুশ্চিন্তায় ভুলেই গেছিল চিঠিটার কথা। কী একটা লিখবে বলে ডায়েরিটা খুলেছে কয়েকদিন বাদে। অমনি চিঠিটা বেরুল। মনে প্রশ্ন জাগল, কার চিঠি? কে তাকে পাঠাল বিয়ের নিমন্ত্রণ? খুলেই দেখা যাক না কার বিয়ে? আনমনে খুলল চিঠিটা। রওশনের বিয়ের কার্ড। ছোট্ট একটা চিঠিও রয়েছে ভেতরে। লেখা রয়েছে–
– ভাইয়া, অবশ্যই এসো কিন্তু। না এলে বাবা-মা খুব কষ্ট পাবেন। আমিও।
মুস্কিলে পড়ে যায় তুহিন। আগামীকালই বিয়ে। আজ না খুললে তো বিপদেই পড়ত সে। চিঠিটা এ ক'দিন না খুলে কী বোকামিটাই না করেছে। রওশনের বিয়েতে সে থাকবে না, এ তো হয় না; হতে পারে না। এ অন্যায়। সে যাবে। আজ যেতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু ছুটি নেয়া হয় নি। খেয়াল হলো, কাল তো শুক্রবার। শনিবার তার ক্লাস নেই। তাই ছুটির তো প্রশ্নই ওঠে না। সে আজই যেতে পারে। কিন্তু বিয়ের উপহার কেনা হয় নি। খালি হাতে তো যাওয়া যাবে না। কাল কী দেবে সে বিয়েতে? বুঝে উঠতে পারছে না। হঠাৎ খেয়াল হলো, পুরী থেকে আনা

চমৎকার এক ছড়া মুক্তোর মালা আছে তো তার কাছে। সিঁদুরও আছে এক কৌটা। মন্দ কী? হিমানীর কথা মনে এল। সে কি হিমানীর জন্য কিনেছিল এ সব? হয়তবা। হয়তবা না। হিমানী আজ মৃত তার কাছে। 'তার প্রেম আজ ঘাস হয়।' হিমানী নয়, রওশনকেই দেবে সে এ মালা।
হঠাৎ খেয়াল হলো, সিঁদুর? সিঁদুর দিয়ে কী করবে রওশন? ওটা তো দেয়া যাবে না তাকে? সিঁদুরের কৌটাটাই থাক তার প্যান্ডোরার ঝাঁপি হয়ে। যে সিঁদুর পরানো হলো না, থাক তা স্মৃতি হয়ে। 'ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া; পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর'।
রাত হলো বাড়ি পৌঁছতে। অন্ধকার। আলো জ্বালতে ইচ্ছে হলো না। কেউ জানে না তার বাড়ি আসার কথা। কাউকে বাড়ি আসার খবর জানাতেও ইচ্ছে হলো না। ক্ষিধে পেয়েছে বেশ। কী খাবে, কোথায় খাবে? তাই ব্যাগের মধ্যে থাকা এক প্যাকেট বিস্কুট খেয়েই রাত পার করে দেবে ভাবছে। সকালে খবর দেবে সবাইকে। রওশন হয়ত ভাবছে, তুহিন বাড়ি আসে নি। যখন সকালে দেখবে সে বাড়ি এসছে, তখন কী যে খুশি হবে! সেই ভালো।

হাতমুখ ধুয়ে বিছানাটা ঝাড়া দিয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। এ গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ আসে নি। ঘরের কোথায় হ্যারিকেন, কোথায় কেরোসিন, কে জানে? বুদ্ধি করে মোমবাতি আর ম্যাচ কিনে আনলেই ভালো হতো দোকান থেকে। তা মাথায়ই আসে নি। অন্ধকারে চামচিকের মতো বসে থাকতে হতো না তা হলে। অন্ধকারে দু'টো জিনিস খুব কাছে আসে। মশা আর দুশ্চিন্তা। এলোমেলো চিন্তা। এলোমেলো চিন্তার কাছে তাই নিজেকে সমর্পণ করে দেয় তুহিন। রাকার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মিহিরবাবুর কথা। সেই অচেনা মেয়েটার কথা। সব পথ এসে শেষে মেঘশিমুলে মেশে। মেঘশিমুলে পৌঁছে হিমানীর কাছে এসে মানসভ্রমণের যাত্রা বিরতি। হিমানীর দরজায় এসে থামে। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ। তুহিন বুঝে উঠতে পারে না, সে তো কড়া নাড়ছে না হিমানীর দরজায়; তবে শব্দ এলো কোত্থেকে? কে নাড়ছে কোন্ দরজায় কড়া? আবার শব্দ।
বাস্তবতায় ফিরে আসে তুহিন। নিজকে আবিষ্কার করে গ্রামের বাড়িতে নিজের ঘরে। এ রাতে কে নাড়ে কড়া? কেউ তো জানে না তার বাড়ি ফেরার কথা। অবাক হয়। আবার কড়া নাড়া। বলে ওঠে– কে? ওপাশ থেকে জবাব আসে– ভাইয়া, অমি রওশন। দরজা খোল। এবার আরও বিস্ময়ের পালা। রওশন জানল কী করে তার বাড়ি ফিরে আসার কথা? তাছাড়া কাল তার বিয়ে। এ সময়, এত রাতে তার তো আসা মোটেই উচিত হয় নি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রওশনকে ভেতরে ডেকে আনে তুহিন।

- এসো, এসো। তুমি কী করে জানলে রওশন, আমি বাড়ি এসেছি? কেউ তো জানে না, আমার বাড়ি আসার খবর। ভালো আছো নিশ্চয়ই?
- ভাইকে কাছে পেলে কোন বোন না ভালো থাকে? তোমার ছেলেবেলার বন্ধু সুলতান ভাই তোমাকে বাড়ি ফিরতে দেখেছে। তার কাছেই খবরটা পেলাম। বেশ তো চুপি চুপি আসা হলো?
- না না, আজ এখানে, এই রাতে এসে মোটেই ঠিক করো নি তুমি। কাল তোমার না বিয়ে? এ সময় কেউ বেরয় ঘর থেকে?
- ভাবলাম, তুমি যা মানুষ; না খেয়ে অন্ধকারেই শুয়ে থাকবে। ঠিক তাই-ই দেখছি এসে। এ জন্যই খাবার নিয়ে এলাম। বিয়ে তো কী হয়েছে? তুমি যে না খেয়ে থাকতে আমি না এলে? সেটা কি ভালো হতো? কাল যখন জানতাম, তখন আমার খারাপ লাগত না?

বলতে বলতে খাবার ভর্তি টিফিন ক্যারিয়ার এবং জলের জগ নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর ম্যাচ জ্বেলে মোমবাতি ধরাল। ম্যাচ আর মোমবাতি সাথে করেই নিয়ে এসেছিল রওশন। মোমবাতি জ্বালিয়েই আসছিল। পথে নিভে গেছে বাতাসে। এই অনুযোগ, এই শাসনের কাছে পরাজিত হয় তুহিন। তার ভালো লাগে এই মিষ্টি শাসন। ভালো লাগে আদুরে বকুনি। সে উঠে হাত ধুয়ে সুবোধ বালকের মতো খেতে শুরু করে। যেন খায় নি সে কতদিন। কিংবা এমন করে খাওয়া হয় নি কোনোদিন। কী এক দুর্বোধ্য অজানা কষ্ট গলিত লাভার মতো ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। বরফ গলা জলের মতো নাক, মুখ, চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় এক বুক জমানো কান্না। কষ্টের নয়, আনন্দের। অশ্রুও সুখের হয়, জানা হলো তুহিনের।
পৃথিবীতে শুধু কষ্টই সত্যি ভেবেছিল সে। যাবতীয় সুখ মিথ্যে। এমন সুখও আছে পৃথিবীতে, জানা ছিল না তুহিনের। সেও নিঃস্ব নয়। সেও একা নয়। তারও স্বজন আছে। তার কথাও কেউ ভাবে। তার জন্যও কারও মন খারাপ হয়। নিজেকে খুব সুখী ভাবতে ইচ্ছে জাগে তার। বহু কষ্টে কান্নাটাকে চেপে রেখেছিল তুহিন। আর পারল না। হাউমাউ করে কেঁদে দিল। বহু দিনের বহু জমানো কান্না বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো বেরিয়ে এল। রওশন হতবাক দাঁড়িয়ে থাকে। এ কান্নার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না সে। তুহিনকে অচেনা মনে হয় তার।

আট

মোমশিখার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে রওশন। কখনও সরু হয়ে জ্বলতে থাকে। কখনও কেউটে সাপের বাচ্চার মতো কেঁপে কেঁপে। তুহিনের শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে ওঠার মানে সে খুঁজে পায় না। তারও মনটা খারাপ হয়ে যায়। কী করবে, বা কী করা উচিত, বুঝে উঠতে পারে না। ইচ্ছে হয় তুহিনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, চুলে আঙুল চালিয়ে বিলি কেটে দেয়। সাহস হয় না। যদি কিছু মনে করে! ইচ্ছে পাখা মেলে না। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর খেতে পারে না তুহিন। উঠে পড়ে। রওশন বলে ওঠে–

- ও কী করছ ভাইয়া, খাবার শেষ না করে উঠে গেলে?
- ইচ্ছে হচ্ছে নারে? আর খেতে পারব না।
- সে হবে না। ওটুকু খেতে হবে। মা কত কষ্ট করে সিং মাছের ঝোল রেঁধেছে তোমার জন্যে, তোমার প্রিয় বলে? আর তুমি খাবে না? মা কষ্ট পাবে না তাহলে? নাও, বসো। খেয়ে ওঠো।

খেতে বাধ্য হয় তুহিন। খাওয়া শেষ করে, হাত ধুয়ে বলে–

- এবার তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও রওশন। রাত হলো বেশ।
- হ্যাঁ যাচ্ছি। এ গুলো একটু গুছিয়ে নেই।
- চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি বাড়ি।
- সে আর দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব।
- না না, এত রাতে একা যাবে কেন?
- তেমন কোনো রাত হয় নি। তাছাড়া, তুমি ক্লান্ত। বিশ্রাম নেও।
- মোটেই ক্লান্ত নই। আর তোমাকে একাইবা ছাড়ি কী করে? চলো তো, সঙ্গে যাই। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।
- ভাইয়া, ব্যস্ত হয়ো না তো। আমি কি হিল্লি-দিল্লি যাচ্ছি যে সঙ্গে কাউকে নিতে হবে? এ তো এক মিনিটের পথ? তোমার যেতে হবে না। পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ঠিকই যেতে পারব।
- আচ্ছা, ঠিক আছে। মোমটা সাথে করে নিয়ে যাও তাহলে।
- তুমি যে অন্ধকারে থাকবে?
- আমি তো এখনই ঘুমুব। আলো দিয়ে কী করব?
- রাতে দরকার হতে পারে না?
- না। পারে না। মোমটা তুমি নিয়ে যাও।
- আচ্ছা, আচ্ছা– নিলাম তাহলে। হলো তো?

রওশনের পেছন পেছন তুহিন বাড়ির কিনার পর্যন্ত যায়। রওশন চলে যায়। তুহিন দাঁড়িয়ে থাকে পথের পাশে। যতক্ষণ পর্যন্ত মোমের আলো দেখা যায়, তুহিন চেয়ে থাকে পথের দিকে। মোমশিখা অদৃশ্য হলেও তুহিন দাঁড়িয়েই থাকে সেদিকে তাকিয়ে। সে যেখানে দাঁড়ানো, তার পাশেই দাহ করা হয়েছে মাকে। সেদিকে চেয়ে থাকে। মোমশিখাটা যেন মায়ের চিতা হয়ে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে চিতার কাঠ। মনে পড়ে। আগুনের ভেতর থেকে তাকিয়ে রয়েছে মা। তার দিকে। আগুনের ভেতর জ্বলছে একলা মা। জ্বলছে আর ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে মৃত্তিকায়। মিশে যাচ্ছে মাটিতেই। একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, আর কুণ্ডলায়িত ধোঁয়া হয়ে উঠে যায় আকাশে। মা তার, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অদৃশ্য হয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মাতৃহারা নাবালক শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে তুহিন। যেন এইমাত্র সে তার মাকে দাহ করা শেষ করেছে। মাকে হারিয়ে সে সম্পূর্ণ এতিম। বড় বেশি একা।

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ, খেয়াল নেই। বাজপাখির কর্কশ চিৎকারে ফিরে আসে বাস্তবে। দূরে কোথাও রাতজাগা নিমপাখি একটানা ডেকে চলে। ছাতিম ফুলের গন্ধে ছেয়ে আছে বাড়িটা। বাড়ির এক পাশেই পুরনো কালের এক বিশাল ছাতিম গাছ। রাত গভীরে পুরো গাছটা ফুলে ফুলে একেবারে সাদা হয়ে যায়। ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে খামচি মারে । কেমন মাতাল করে তোলে। নেশায় অবশ করে। প্রকৃতিও শুরু করেছে একটু একটু কুয়াশার চাদর গায়ে জড়াতে। উত্তর থেকে বইছে মৃদু হিম হিম হাওয়া। সব মিলিয়ে কেমন এক ঘোর লাগে তুহিনের। সেকি ভালো না মন্দ; আনন্দের না কষ্টের, বুঝে উঠতে পারে না। ধীরে ধীরে ঘরের দিকে পা বাড়ায়, যেখানে জমে আছে সুবিশাল অন্ধকার। সীমাহীন নীরবতা। আর অসহনীয় নিঃসঙ্গতা।

মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। ঘুম আসছিল না। পরিত্যক্ত দালানের চামচিকার মতো নির্ঘুম রাতের ভাবনারা ওড়াউড়ি করে। কতক্ষণ, খেয়াল নেই। এক সময় দেখে, মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মা। ধপধপে সাদা একখানা শাড়ি পরা। মাথার চুলগুলোও সাদা। দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বলছে– খোকা, তোর ঘুম আসছে না, বাবা? ঘুমো। তুই এত অস্থির কেন? এবার বিয়েটা সেরে ফেল। দেখবি এত দুশ্চিন্তা হবে না। একা একা তোর ভালো লাগছে না আর, তাই না খোকা? হিমানীর জন্য খারাপ লাগছে তোর? বড় ভালো মেয়ে। খুব ভালোবাসত তোকে। এখনও বাসে। খুব কষ্ট হচ্ছে নারে খোকা?

কখন কোথা থেকে আবার হিমানী ঢুকে পড়ে মাথার ভেতর। সে দেখে তার মাথার কাছে মা নয়, হিমানী। শাড়িটাও সাদা নয়, হাল্কা কলাপাতা রঙের। হাতে শাঁখা। কপালে সিঁদুর। সিঁদুরটা কেমন রক্তজবার মতো লাল টকটকে। যেন তার চোখ পুড়িয়ে দেয়। কেমন জ্বালা ধরায় চোখে। কারও কপালের সিঁদুর এমন খাঁ খাঁ করে! এমন পোড়ায়! চোখ মেলে। ঘুম ভেঙে যায়। পুবের জানালা গলে চোখে এসে পড়ছে ভোরের রোদ। উঠে বসে বিছানায়। এ তাহলে সত্যি নয়, স্বপ্ন? জগৎটাই তো একটা স্বপ্নবাসর। জীবনটাই তো স্বপ্ন। সত্যি কিছু নয়। এই যে সে ভোরের নরম রোদ গায়ে মেখে বসে আছে নিরালায়, এও একদিন ধূসর হবে; মিথ্যে হবে। বর্তমানই সত্য; আর সব মিথ্যা। স্বপ্ন। স্বপ্নময়। স্বপ্নটা সুখের কি শোকের, বুঝতে পারে না। তবুও চোখ বুঁজে উপলব্ধি করতে চায় তা। গৌতম বুদ্ধ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ ধ্যানে।

সকাল থেকে সরগরম বিয়েবাড়ি। দশ-বারো জন লোক সকালেই বর আনতে চলে গেছে সুলতানের নেতৃত্বে। পাত্র চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনিস চৌধুরীর একমাত্র ছেলে হাবিবুর রহমান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম. পাস করে সদ্য বাবার ব্যবসার কাজে যোগ দিয়েছে। ভদ্র। সুদর্শন পাত্র। রওশনদের বাড়ি পৌঁছেই ছবি দেখেছে তুহিন। তার খুব পছন্দ হয়েছে। মুখে একটা সারল্য আছে। কেমন মায়াময় চেহারা। কথায় বলে, Face is the index of mind. মুখ হচ্ছে মনের আয়না। খুব সুখী হবে রওশন।

বিয়ে বাড়িতে যা হয়, তা সবের কমতি নেই কোনোটার। সকাল থেকেই চলছে আয়োজন। বিয়ের আসর সাজানো হচ্ছে যত্নের সাথে। রাতের জন্য এখনই চলছে লাইটিং এর আয়োজন। কাছের ও দূরের আত্মীয়-স্বজন এসে গেছে আগেই। শিশু-কিশোরদের উল্লাস, বাচ্চাদের কান্নাকাটি, বড়দের হাঁক-ডাক সব মিলিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড। এক পাশে আয়োজন রাখা হয়েছে পান, বিড়ি, সিগারেট ও চা-বিস্কুটের। যার যখন যেটা প্রয়োজন, খাচ্ছে চেয়ে চিন্তে। তুহিন এ বাড়িতে এসছে মাত্র ঘণ্টাখানেক। এরই মধ্যে দু'বার হয়ে গেছে চা পান করা। এ উপলক্ষ্যে দেখাও হয়ে গেল পুরনো দু'চার জন বন্ধুর সাথে। নানা বিষয়ে নানা আলোচনায় মনটায় স্নিগ্ধতা ফিরে এল। ভালোই লাগছে এই হৈ-হুল্লোড়।

বিশাল আয়োজন। তিন-চারশো লোকের রান্না চলছে। বরযাত্রীই হবে কম করে হলেও একশো। আত্মীয়-পরিজন; এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি সব মিলিয়ে ব্যাপক আয়োজন। খাসিই জবাই করা হয়েছে সাত-আটটা। পুকুর থেকে ধরা হয়েছে বিশাল বিশাল সাইজের গোটা দশেক রুই মাছ। সকাল থেকেই চলছে রান্না। এখানে মাংস কসানো হচ্ছে, তো ওখানে মাছ ভাজা। একদিকে চলছে পোলাও রান্নার প্রস্তুতি। মসলা বাটার শব্দ। মসলা কসানোর গন্ধ। মাছ ভাজার গন্ধ। মাংসের গন্ধ। সব মিলিয়ে এক অন্য রকম পরিবেশ। উৎসবের আমেজ। আনন্দে আনন্দময় গোটা বাড়ি। এখানে যেন কষ্টের কোনো স্থান নেই। কারও মুখে এতটুকু কষ্টের রেখা নেই। সবাই আনন্দে মাতোয়ারা। সবার মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা। পরম প্রশান্তি।

দুপুরেও ছোটখাটো একটা ভোজ হয়ে গেল। সঙ্গত কারণেই তুহিন এখানেই খেল। খাওয়া শেষে বহুদিন পরে একটা পান খেল। পানটা গালে দিয়েই মনে পড়ল হিমানীর কথা। সেবার আড়ং এ ঝালপান খেয়ে হিমানীর সে কী ছটফটানি! নাকের জলে, চোখের জলে একাকার। পান খেতে গিয়ে মগজের মধ্যে আবার ঢুকে গেল মেঘশিমুল। কে রেখেছিল এই গ্রামের নাম মেঘশিমুল? মেঘশিমুলের কথা যখনই মনে আসে, তখনই সমস্ত চেতনা মেঘে ছেয়ে যায়। দু'চোখে বর্ষা নামে। মনে পড়ে মান্না দে'র সেই প্রিয় গানটার কথা–

'আমি আজ আকাশের মতো একেলা,
কাজল মেঘের ভাবনায়, বাদলের এই রাত ঘিরেছে ব্যাথায়।'

সকালে কলসি কাঁখে মেয়েরা গেছে জল ভরতে পুকুর ঘাটে। সকালেই হয়েছে রওশনের গায়ে হলুদ। এমন করে কাছ থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান কবে দেখেছে তুহিন মনে পড়ে না। সবাই ব্যস্ত নানা কাজে। তুহিন তেমন কিছু করতে পারছে না বলে খারাপ লাগছে। কী করবে, কী করা উচিত বা কী করতে পারে– তা ই বুঝে ওঠে না। এ রকম অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও ছিল না। নিজকে কিছুটা অকর্মণ্য লাগছে।

উৎসবের বিকেল। সন্ধে হবার আগেই জ্বলে উঠছে আলো। আলোয় আলোয় সারা বাড়ি আলোকিত। 'আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন ভরা; আলো নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয়হরা।' বউ সাজে সাজানো হচ্ছে রওশনকে। বিয়ে পরানোর সময়ের আর বেশি দেরি নেই। বর যাত্রীরা অবশ্য এখনও এসে পৌঁছয় নি। এসে যাবে হয়ত খুব শীঘ্রই। সবারই অপেক্ষার পালা তাদের জন্য। সেই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য সবারই দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

বিয়ের সময় পার হয়ে গেলেও বর কিংবা বরযাত্রী কেউই এল না তখনও। এবারে দুশ্চিন্তার পালা। ধীরে ধীরে ভাঁজ পড়তে লাগল সবার কপালে। কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তাদের। ফোন কিংবা মোবাইলে যোগাযোগেরও কোনো কায়দা নেই। বাজারে কেবল মোবাইল ফোন চালু হয়েছে। শহরে দু'একজনের হাতে দেখা যায়। এ গ্রামে ও জিনিসটি কারও নেই। তাই যোগাযোগও করা যাচ্ছে না। অতএব অপেক্ষার পালা। নানা জন নানা কথার ঢিল ছুঁড়ছেন। নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। পারছেন না কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।
সন্ধে উৎরে যায়। একটু পরপর ঘড়িতে চোখ রাখে সবাই। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। বর আসে না। বরযাত্রী আসে না। বর আনতে যারা গেছে, তারাও ফিরছে না। দুশ্চিন্তার কালো মেঘে ছেয়ে যায় বিয়েবাড়ি। রাত হয়ে পড়ে বেশ। কেউ কেউ বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। কোনো খবর আসে না। গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন সোলেমান চাচা। চাচি বসে কাঁদেন। রওশন তাকিয়ে থাকে উদাস চোখে। সবাইকে ভেদ কর দৃষ্টি যেন চলে যায় কোন সুদূরে। বর আসে না। তুহিনেরও চিন্তা হয়। আনন্দের এত কাছে থাকে দুঃখ, জানা ছিল না। নিভে আসে আলো। বন্ধ হয় বাজনা। সকালে যে বাড়ি ছিল সরগরম, রাতে সে বাড়িতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কেউ জোরে কথাও বলছে না। বাচ্চারা কেঁদেকেটে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোকের ছায়া নেমে আসে বাড়িতে।
বড় রাস্তা থেকে কে একজন দৌড়ে এসে খবর দেয়– বর আসছে। দু'টো বড় বাস নিয়ে তারা গেছিল বরযাত্রী আনতে। বরের জন্য প্রাইভেট কার। ফুলে ফুলে সাজানো। গাড়িগুলো এসে থামতেই যারা অপেক্ষা করছিল রাস্তায়, ছুটে গেল গাড়ির কাছে। বর আসছে, এটাই সান্ত্বনা। একজন তাড়াতাড়ি ছুটে এল বাড়িতে খবর দিতে।

আবার জ্বলল আলো। আবার বাজনা শুরু। আবার সরগরম বিয়ে বাড়ি। বচ্চারা ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। রওশনের মা চোখ মুছতে মুছতে হাসল। সোলেমান চাচা পথের দিকে এগুলেন। রওশনের মুখে হাসি ফুটল। গেটে বর এবং বরযাত্রী আটকানোর জন্য ছুটল কিশোর-কিশোরীরা। আবার আনন্দ উল্লাসে মুখরিত বাড়ি। স্বস্তি ফিরে পেল তুহিন। আবার তড়িঘড়ি বিয়ের প্রস্তুতি।
অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। যে দশ-বারো জন বর আনতে গেছিল, বাস থেকে তারাই শুধু নামল। বর নেই। বর যাত্রী নেই। কী হয়েছে? কেন হয়েছে? কারও কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না সুলতান। মাথা নিচু করে ধীর পায়ে বাড়ির দিকে এগোয়। পেছনে অন্য সবাই। সকলেই বড় বেশি চুপচাপ। যেন এইমাত্র কাউকে কবর দিয়ে ফিরছে তারা। বাড়িতে আবার শোকের মাতম।
ধপাস করে খাটে বসে পড়ে সোলেমান চাচা। কোনো কথা নেই তার মুখে। চারদিকে সুনসান। বড় বেশি নীরবতা। এত লোক, অথচ কারও মুখে কোনো কথা নেই। মলিন মুখে সুলতান এগিয়ে যায় তাঁর কাছে। কান্নাকে সামাল দেয়। বলে–

- চাচা, যা হয়েছে; ভালোর জন্যই হয়েছে। এখানে বিয়ে হলে বরং রওশনের কপালটাই পুড়ত। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়াই ভালো। আজ ভোর রাতে বরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারী দলের সদস্য সে। মাদক ব্যবসায়ী। কী আশ্চর্য! মানুষের বাইরেটা দেখে ভেতরটা চেনা যায় না কোনোভাবেই। সবাই সভ্য জগতের বাসিন্দা। অথচ ভেতরে ভেতরে কেউ কেউ এমনই কুৎসিত, তা জানা বা বোঝার উপায় নেই।

বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যায় তুহিনের। পাত্রের ছবি দেখে কী প্রশান্তিই না পেয়েছিল সে। ভেবেছিল খুব সুখী হবে রওশন। অথচ এ কী হলো? মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় না তাহলে? কোনোভাবেই তো কাউকে চিনতে পারে না তুহিন। বড় রহস্যময় লাগে এই মানুষকে তার। জটিল আর দুর্বোধ্য। পৃথিবীর মানুষেরা কি সবাই সবার অচেনাই থেকে যায়? অচেনাই থেকে যাবে?
এবার নিশ্চিত হয় সবাই, বর আসবে না আর। সমস্ত শ্রম পণ্ড। পণ্ড সমস্ত আয়োজন। কারও মুখে খাবার রোচে না। যে যার মতো বসে থাকে চুপচাপ। কিংবা গা এলিয়ে দেয় অবসন্নতায়। কত তাড়াতাড়িই আনন্দের অবসান! আর কোনো আশা নেই। কী নিয়ে বসে থাকবে তারা? এবার সত্যিই পাথর হয় রওশন। পাথর দু'চোখ থেকে শুধু গড়িয়ে পড়তে থাকে উষ্ণ প্রস্রবণ। বাড়ির কুকুরগুলোও যেন টের পেয়ে গেছে এ কষ্টের খবর। তারা ডাকছে না। নড়ছে না। চুপচাপ শুয়ে আছে কুণ্ডলি পাকিয়ে।
তুহিন ভাবে,'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়'। সে যা ছোঁয়, তাই পুড়ে ছাই হয়। যেখানে সে যায়, সেখানেই বিপত্তি ঘটে। নিজকে তার অপয়া মনে হয়। এ কি সবারই হয়? নাকি কেউ কেউ থাকে সারাজীবন যার কষ্টেই কাটে? বুদ্ধের দর্শন কি সবার বেলায় খাটে? নাকি কারও কারও বেলায় খাটে, কারও কারও বেলায় খাটে না? কে দেবে এর মীমাংসা? কে দেবে এর উত্তর? আরও কিছু যন্ত্রণা সঞ্চয় করে তুহিন। সমুদ্র-মন্থনের বিষ পান করে মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিল। সেও কি জীবন-মন্থনের বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হবে?

নয়

মেঘশিমুলে মেঘ জমেছে। কী হবে আর মেঘ জমিয়ে? এর চেয়ে বৃষ্টি ঘটানোই ভালো। মেঘ কেটে যাবে। হিমানী তার কে? কেন তাকে নিয়ে তার এ আকাশ-কুসুম কল্পনা? বরং সে যদি দাদা ডেকে সুখ পায়, ক্ষতি কী? আর হিমানী তো এখন অন্যের স্ত্রী। বৃথাই তার কষ্ট পাওয়া। বড় ইচ্ছে জাগে হিমানীকে দেখতে। যাবে সে। মেঘশিমুলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় তুহিন। তিন-চার দিনের ছুটি দেখে কোনো এক দুপুরে বেরিয়ে পড়ে মেঘশিমুলের উদ্দেশে।

বাস থেকে যখন নামে, তখন অপরাহ্ণ। কী এক দ্বিধা এসে পথ রোধ করে। কেমন এক জড়তা কাজ করে। এতদিন বাদে কী জন্যে আসা? কেন আসা? নানা প্রশ্ন। তাছাড়া কী ভাববে হিমানী? কী মনে করবে? কালক্ষেপণ করার জন্য চায়ের দোকানে ঢোকে। চায়ের পিপাসাও লেগেছিল কিছুটা। একটু ক্ষিধেও পেয়েছিল। এক কাপ চা আর দু'টো বিস্কুট খায়। উঠতে ইচ্ছে করছে না। ক্লান্ত লাগছে খুব। মনে হয় কত দিনের কত জমানো কষ্ট এসে যেন ভিড় করেছে হাঁটুতে। পা দু'টো অচল হয়ে আছে। মনে শক্তি সঞ্চয় করে পা বাড়ায় পথের দিকে।
এবার গমক্ষেত নেই। কার্তিক মাস। পাকা ধানের গন্ধে ম'ম' করছে মাঠ। রুক্ষ প্রান্তর। সারা মাঠে ছড়ানো সোনা। কৃষকেরা ধান কাটছে। আজও সূর্যাস্ত। দীর্ঘ গৈরিক মাঠের পরপারে সেদিনের সেই সূর্য ডুবতে বসেছে। পথে পথে কেমন মায়া ছড়ানো। কত কত দিন পর দেখা হবে হিমানীর সাথে। কী যে ভালো লাগছে তার! শুধু কি ভালোই লাগছে? সমপরিমাণ কষ্টও কি লাগছে না? সে এখন সুখ-দুঃখের পেন্ডুলাম হয়ে দুলছে। সে কি পুষে রেখেছে স্মৃতি? সে কি ভুলে গেছে তারে? সে কি ভোলে নি? মনে পড়ে সুধীন দত্তের 'শাশ্বতী' কবিতার সেই পঙ্‌ক্তি–

'কিন্তু সে আজ আর কারে ভালবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে;
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে মনটা তার আবার ব্যথায় টনটন করে ওঠে। হিমানীর সামনে সে কী দাবি নিয়ে দাঁড়াবে? হিমানীর কপালে হেমন্তের রক্তিম সূর্যাস্ত চিরস্থায়ী হয়ে আছে। বধূবেশী হিমানীকে সে সহ্য করতে পারবে কি? সেদিনের সে সানাইয়ের সুর ভেসে ওঠে বাতাসে। তার সমস্ত অন্তরাত্মা চিরে সেই সুর আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। 'সমস্ত আকাশে বাজে অনাদি কালের বিরহ বেদনা।'
সে তার কেউ নয়, অথচ অনেক কিছু যেন। সে তার কী নয়? 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা; মম শূন্য গগন বিহারী, আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা; তুমি আমারই।'

শাঁখের করাতে কাটছে মন। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে জীবনী শক্তি। মাথার ভেতর ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাস, বুকে সমুদ্র-গর্জন। না, সে হিমানীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মনটা আরও ভেঙে পড়বে। বরং না দেখাই ভালো। অদেখা বন্ধুর মতো চলে যাবে মেঘশিমুল থেকে। ফিরবে না কখনও আর এই নাড়ামাঠ, চিনা-কাউন, গমক্ষেতের অনন্ত সূর্যাস্তের দেশে। সেও পথের মতো হারিয়ে যাবে। সেও নদীর মতো আসবে না ফিরে আর কোনোদিন।
পা বাড়ায় ফিরতি পথে। যেন স্বপ্নে হাঁটে। পা দু'টো পাথরের মতো ভারি। চলছে না। কী এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ পেছন থেকে চোরাবালির মতো টানছে। মগজে ঘূর্ণি। সুতানালী সাপের মতো সেখানে ঢুকে পড়ে হিমানী। পারে না ছাড়াতে। মোহ। আসক্তি। তৃষ্ণার্ত পারে কি ঠোঁটের কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ঠাণ্ডা জলের গেলাস? দৃষ্টির তৃষ্ণায় পুড়ছে তুহিন। ততক্ষণে অন্ধকার চেটে নিয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় আলো। আকাশের বুক থেকে উড়ে গেছে সমস্ত রঙ। অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় না তুহিন। পথ অজানা। মানুষী দুর্বলতার কাছে পরাজিত হয় আবেগী মানুষ।

হিমানীর আকর্ষণই জয়ী হয়। এত দূর এসে ফিরে না যাওয়াই সমীচীন মনে করে সে। তা ছাড়া এ বাড়ি গেলেই যে দেখা হবে হিমানীর সাথে, এমন তো কোনো কথা নেই। কারণ, এটা তার বাবার বাড়ি। সে তো এখন শ্বশুর বাড়িতেও থাকতে পারে। এই দুঃখ-সুখের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িতে সে আর একবার যেতে চায়। শুধু একবার। শেষবার। হিমানী থাক বা নাই থাক, সে যাবে। ওর বাবার সাথেও তো দেখা করে আসতে পারবে। এই সব দ্বন্দ্ব-দোলায় দুলে ফেরে সে হিমানীর বাড়ির পথে। আবার মনে পড়ে সেই গানটা– ফেরারি পাখিরা বুঝি ফেরে না ঘরে। সে ফেরে, কি ফেরে না– বোঝে না তুহিন। সে ফিরেছে কি ফেরে নি– তাও জানে না।

এ ঘরে এখন বিজলী বাতির আলো। যখন সে প্রথম এসেছিল এ গ্রামে, তখন বিদ্যুৎ ছিল না। হ্যারিকেন জ্বালাত। এখন সুইচ টিপলেই আলো। জ্বালানোর কষ্ট নেই। ঘর আলোকিত ছিল না তবুও। কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। লোক নেই, জন নেই। তবু বোঝা যায়, কেউ আছে ঘরে। নিঃশব্দ থাকলেও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় মানুষের। যেন তার নিঃশ্বাসের গন্ধ হাওয়ায় ভাসে। বলে দেয় সে আছে। এখানেই আছে। উঠোনের অন্ধকারে তুহিন স্থির দেবদারু। যেন অনাদি অনন্তকাল ধরে অনড়। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তুহিন অদেখা বন্ধু। চেনা আগন্তুক। দুরুদুরু বুক। অজানা সুখ।

সুন্দর এক পবিত্র গন্ধ ঘিরে আছে ঘরটা। একটু আগেই সন্ধ্যা দিয়েছে হয়ত। প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় জ্বালানো হয়েছে সন্ধ্যাপ্রদীপ। ধূপের গন্ধ স্বাগত জানায়। উঠোনের চারপাশে রজনীগন্ধার ঝাড়। সুমিষ্ট সুবাস। স্বর্গীয় এক আবেশ ছড়িয়ে রয়েছে সারা উঠোনে। এই তো স্বর্গ, এই তো অমরাবতী! এক মুহূর্তে মনে হয়, পৃথিবীতে এটুকু পাওয়াই কম কীসের? নিজকে ভাগ্যবান মনে হয়। সে ভুলে যায় বাহ্যিক পৃথিবী। সে কোথায়, কেন এসেছে– কিছুই স্মরণে নেই। সে কে, হিমানী কে– এসব তার স্মৃতিতে বাহুল্য। সে এখন চিল, নিঃসঙ্গ চিল; সোনালি ডানার চিল। ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে ধীরে। উঠোনের অন্ধকারে সে এখন ক্লান্ত, ক্লান্ত ডানার চিল–

'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকার' ...